নাটক

সিরাজ-উ-দ্দৌলা

সিকান্দার আবু জাফর

ইউনিট ১

ভূমিকা

সাহিত্যের অন্যতম শাখা নাটক সম্পর্কে আমরা সকলেই কম-বেশি অবহিত আছি। নাটক তুলনামূলকভাবে আধুনিক সাহিত্য শাখা। বাংলা নাটকের বয়স মোটামুটি দুশো বছর। মাধ্যমিক পর্যায়ে আপনারা নাটক পড়েছেন, উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যসূচীতেও নাটক অন্তর্ভুক্ত আছে। এ পর্যায়ে আপনাদের পাঠ করতে হবে সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫) বিরচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' (রচনাকাল ঃ ১৯৫১, প্রকাশকাল : ১৯৬৫) নাটক। মূল নাটকে অনুপ্রবেশের পূর্বে নাটকের সংজ্ঞার্থ ও শিল্পরূপ, নাটকের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য, বাংলা নাটকের ইতিহাস, সিকান্দার আবু জাফরের জীবন ও সাহিত্যসাধনা, সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটক সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। বর্তমান ইউনিটে আমরা উপরের বিষয়সমূহ অনুধাবনে সচেষ্ট হবো।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. নাটকের সংজ্ঞার্থ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
২. নাটকের উপাদান, আঙ্গিক ও গঠনকৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৩. নাটকের শ্রেণীবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করতে পারবেন;
৪. নাটকের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
৫. বাংলা নাটকের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
৬. বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে পারবেন;
৭. সিকান্দার আবু জাফরের জীবন ও সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
৮. 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকের প্রাসঙ্গিক পরিচয় লিখতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- নাটকের সংজ্ঞার্থ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- নাটকের শিল্পরীতি আলোচনা করতে পারবেন।

☞	মূল পাঠটি কয়েকবার পড়ুন ও বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনার বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেওয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

মূলপাঠ

নাটকের সংজ্ঞার্থ

যে-কোন শিল্প কর্মেরই সংজ্ঞার্থ প্রদান রীতিমতো দুরূহ বিষয়। কেননা, মহৎ সৃষ্টিশীল প্রতিভা কেবল পুরোনো সংজ্ঞানুবর্তিতায় আবদ্ধ থাকেন না, বরং সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি নতুন সংজ্ঞার্থ নির্মাণ করেন। তবু বোঝার সুবিধার্থে আমরা সাহিত্যের সব শাখারই সংজ্ঞার্থ প্রদানের চেষ্টা করি। নাটকের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হচ্ছেনাটক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, নাটক– সাহিত্যের এইসব বিচিত্র শাখার মধ্যে নাটক এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। দেখা ও শোনার যুগপৎ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে একটি প্রকৃত নাটক। অর্থাৎ নাটক একই সঙ্গে দেখা ও শোনার বিষয়। এই দুটি মৌল বিষয় নাটকের প্রধান শিল্প-বৈশিষ্ট্য হলেও, আমরা নাট্যগ্রন্থ পাঠ করেও সাহিত্য রস আস্বাদন করতে পারি।

সহজ কথায় আমরা নিম্নোক্তভাবে নাটককে সংজ্ঞায়িত করতে পারি– মঞ্চে অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাহায্যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ বেদনা যখন সংলাপের আশ্রয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন তা হয় নাটক। ইংরেজিতে বলা হয় "Drama is the creation and representation of life in terms of theater"

নাকট একটি সামবায়িক শিল্প। মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী কর্তৃক অভিনীত হবে এ উদ্দেশ্য নিয়েই নাট্যকার নাটক রচনা করেন। 'নাটক' শব্দটির মধ্যেই রয়েছে এ সত্যের ইঙ্গিত। নট, নাট্য, নাটক এ তিনটি শব্দেরই মূল হলো নট্। আর নট্ এর অর্থ হলো নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা ইত্যাদি। নাটকের ইংরেজি প্রতিশব্দ Drama`-র মধ্যেও একই সত্য আমরা খুঁজে পাই। Drama শব্দের মূলে রয়েছে গ্রীক শব্দ Draein, যার অর্থ 'to-do` অর্থাৎ কিছু করা। নাটকের মধ্যে আমরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথাবার্তা এবং হাত-পা-মুখ-চোখ নড়াচড়ার মাধ্যমে জীবনের বিশেষ কোন দিক বা ঘটনার অভিনয় দেখতে পাই। অভিনীত হবার উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকের সৃষ্টি হলেও, কেবল পাঠ করেও আমরা নাটকের রস উপলব্ধি করতে পারি। তবে মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমেই নাটকের মৌল উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কাজেই নাট্যগ্রন্থ পাঠ করে যে আনন্দ লাভ, নাটকের শিল্পরূপ বিচারে তা মুখ্য নয়, গৌণ বিষয় মাত্র।

নাটকের শিল্পরীতি

সংজ্ঞার্থ থেকে জেনেছি, মানবজীবনের বিশেষ কোন ঘটনার সংলাপময় শিল্পরূপই নাটক। কিন্তু নাটক হয়ে উঠতে হলে নাট্যকারকে কয়েকটি জরুরি বিষয় মেনে চলতে হয়। এই জরুরি বিষয়গুলোকেই নাটকের শিল্পরীতি বলে। বস্তুত, এইসব শিল্পরীতি মেনে চলাই একটি সার্থক নাট্যকর্মের মৌল ভিত্তি। শিল্পরীতির এই বিষয়গুলো হলো– কর্ম বা ক্রিয়ার গতিবেগ (action) সংঘাত (conflict), আকস্মিকতা (unexpectedness), উৎকণ্ঠা (Suspense), নাট্যশ্লেষ (dramatic irony) ইত্যাদি।

নাটক জীবনের অনুকরণে নির্মিত হয়, তবে সেই জীবনকেই অনুকরণ করা হয় যে জীবন কর্মময়, গতিশীল, প্রগত এবং পরিবর্তমান। দর্শক শ্রোতার কৌতূহল এবং আগ্রহ ধরে রাখাই হচ্ছেগতিবেগ বা এ্যাকশনের মূল কথা। বস্তুত ক্রিয়া বা কর্মের গতিবেগই জীবনের আনন্দকে ধারণ করে। বিখ্যাত নাট্য সমালোচক শ্লেগেলে তাঁর Dramatic Literature গ্রন্থে লিখেছেন- 'Action is the true enjoyment of life, may, life itself' যা আমাদের চিত্তকে আন্দোলিত করে, তাতেই আমরা আনন্দ পাই। গতি বা এ্যাকশনই আমাদের চিত্তকে আন্দোলিত করতে পারে। নাটকের এ্যাকশনে কেবল নড়াচড়া বা অগ্র-পশ্চাৎ গতি থাকলেই চলে না, তাতে অবস্থান্তর এবং পরিবর্তনশীলতাও থাকতে হবে।

নাটকের গতি প্রথমত অভিনেতা অভিনেত্রীদের মঞ্চে আসা-যাওয়া এবং অঙ্গ-সঞ্চালনের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত নাট্য সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন– "অভিনেতা একভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে কথা বললে তা প্রায়ই একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। সেজন্য তাকে আসতে হয়, যেতে হয়, মঞ্চের মধ্যে নড়াচড়া করতে হয়, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষভাবে হাত, মুখ, চোখ ও ভ্রূযুগল সঞ্চালন করতে হয়। শুধু কেবল আঙ্গিক গতি নয়, বাচিক গতিও নাটকের পক্ষে প্রয়োজন। এজন্য অভিনেতার কণ্ঠস্বর কখনো উচ্চে এবং কখনো বা নিম্নে দ্রুত ও আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। এইভাবে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে নাটকের action আমাদের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আমাদের চিত্তকে কৌতূহলী ও উত্তেজিত করে রাখে।

পরিবেশের উপর নাটকের এ্যাকশন সম্পূর্ণত নির্ভরশীল। বিভিন্ন পরিবেশে এ্যাকশন ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। নাটকের গতি অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন। গতি বা এ্যাকশনের মাধ্যমে নাটকের এই অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন পথযাত্রা অক্ষুণ্ন রাখা হয়। দৃশ্য বা অঙ্ক বিভাজনের সময় নাটকের গতিবেগ সাময়িকভাবে অদৃশ্য থাকে। কিন্তু নাট্যিক গতিতে তখনো আন্দোলিত হতে থাকে দর্শক মন। বস্তুত, গতির আসল উৎস হলো দর্শকের মনোজগৎ। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নাটকের ভিন্ন ভিন্ন

গতিবেগ ফুটিয়ে তুলতে হয়। এ কারণে ঐতিহাসিক নাটকে যে ধরনের এ্যাকশন বা গতি ফুটিয়ে তোলা হয়, সামাজিক বা সাঙ্কেতিক নাটকে তা কার্যকর হতে পারে না।

গতিবেগ বা এ্যাকশন সৃষ্টির জন্য নাট্যকার প্রথমেই যে কৌশল অবলম্বন করেন, তার নাম conflict বা সংঘাত। সংঘাত নাটকের প্রাণ। নাটকে যদি সংঘাত সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে শিল্প হিসেবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নাটকে সংঘাত নানাভাবে দেখা দেয়। গ্রীক নাটকে আমরা দেখি দৈবশক্তি বা নিয়তির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব বা সংঘাত বেধেছে। কখনো কখনো নাটকে সংঘাত দেখা দেয় দু গুচ্ছমানুষের মধ্যে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধই নাটকের প্রধান উপজীব্য। দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নাট্য সংঘাত সৃষ্টি হয়। বিপরীতধর্মী দুই গুচ্ছমানুষের এক গুচ্ছGood বা ভালোর প্রতীক, অন্য গুচ্ছevil বা মন্দের প্রতীক। নাট্যসংঘাত যত তীব্র হয়, নাটক হিসেবে ততই তার সার্থকতা। সমালোচকের ভাষায় 'সেই নাটকের দ্বন্দ্বই নাটকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী, যেখানে উভয় পক্ষই প্রায় সমান শক্তিশালী এবং নাটকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পরাররবিরোধিতায় প্রবৃত্ত। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বের নানা কারণ থাকতে পারে। উদ্দেশ্যের বৈপরীত্য, আদর্শের বিরোধিতা স্বার্থের বিরূপতা ইত্যাদি যে কোন প্রকার দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করা যেতে পারে।

সমাজশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিশক্তির দ্বন্দ্বের ফলেও নাটকে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে। অধিকাংশ নাটকেই আমরা এ ধরনের সংঘাতের সাক্ষাৎ পাই। সমাজনীতি ও যৌনচেতনার বিরোধ, সামাজিক ভেদাভেদের কারণে মতান্তর ও মনান্তর, বিবাহ ও ব্যক্তি অধিকারের সংঘাত, যন্ত্রও জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ, সমাজবাদ ও ধনবাদের সংগ্রাম ইত্যাদি নানা কারণে আধুনিক নাটকে সংঘাত সৃষ্টি হয়।

নাটকে অন্য এক ধরনের সংঘাত দেখা যায়। কোন বহিরঙ্গ কারণে নয়, বরং চরিত্র অভ্যন্তরেই এই সংঘাতের বীজ উপ্ত হয়। বস্তুত, এই দ্বন্দ্বই আধুনিক নাটকের প্রধান দ্বন্দ্ব। প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, সমাজ চেতনার সঙ্গে ব্যক্তি চেতনার, হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে কর্তব্যবোধের, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, আদর্শের সঙ্গে আস্তবের, স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে ব্যক্তি- অনুরাগের দ্বন্দ্ব চরিত্রের অভ্যন্তরে নিয়ত চলতে থাকে। চরিত্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্বই নাটকের মূল সংঘাত। যে কোন ধরনের নাটকেই এই সংঘাত সৃষ্টি করতে হয়।

নাটকে এ্যাকশন বা গতিবেগ সৃষ্টি অপর কৌশল হচ্ছেঘটনা ও চরিত্র সন্নিবেশে আকস্মিকতার আমদানি করা। রঙ্গ-মঞ্চের অপ্রকাশ্য তিন দিক থেকে চরিত্রের আগমন-নিগর্মন বিষয়ে দর্শকের কোন ধারণা থাকে না বলে, নাট্যকার এখানে আকস্মিকতা সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন।

আকস্মিকতার মতো Suspense বা নাট্যোৎকণ্ঠাও নাটকের জন্য অপরিহার্য বিষয়। নাট্যোৎকণ্ঠার জন্যই দর্শক পুরো সময় গভীর বিস্ময় ও উত্তেজনা নিয়ে নাট্য অভিনয় উপভোগ করে থাকেন। নাটকে একটি উৎকণ্ঠা তৈরীর কিছুক্ষণ পর তার উত্তেজনা শেষ হয়ে যায়। অতঃপর পুনরায় নতুন পরিস্থিতির মাধ্যমে নতুন উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করা হয়। এভাবে সাসপেন্স বা উৎকণ্ঠা নাটককে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উৎকণ্ঠা আছে বলেই নাটকের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক শ্রোতার এক অদৃশ্য সেতুবন্ধ তৈরী হয়।

নাটকীয় এ্যাকশন বা গতিবেগ সৃষ্টির একটি বিশেষ উপায় হলো dramatic irony বা নাট্যশ্লেষ নির্মাণ। শ্লেষ অলঙ্কারে যেমন একটি শব্দের দ্বিবিধ অর্থ থাকে, নাট্যশ্লেষেও তেমনি ঘটনা ও সংলাপের মধ্যে নাট্যকার সুকৌশলে দ্ব্যর্থতার সৃষ্টি করেন। নাট্যশ্লেষ দর্শকদের মনে কৌতুক, ব্যঙ্গ ও বেদনা- এসব অনুভূতি উদ্যেক করতে পারে। তাই ট্রাজেডি, কমেডি বা যে কোন ধরনের নাটকেই আমরা নাট্যশ্লেষ লক্ষ করি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. নাটকের সংজ্ঞার্থ দিন।

২. নাটকের প্রধান প্রধান শিল্পরীতি উল্লেখ করুন।
৩. নাটকীয় এ্যাকশন বা গতিবেগ বলতে কি বুঝেন?
৪. নাট্যসংঘাত কি?
৫. নাট্যোৎকণ্ঠা বলতে আপনি কি বুঝেন?

উত্তর

প্রশ্ন ঃ নাটকীয় এ্যাকশন বা গতিবেগ বলতে কি বুঝেন?

উত্তর॥ নাটকে জীবনের অনুকরণ নির্মিত হয়, তবে সেই জীবনকেই অনুসরণ করা হয় যে-জীবন গতিশীল, প্রগত এবং পরিবর্তনমান। দর্শক-শ্রোতার কৌতূহল এবং আগ্রহ ধরে রাখাই হচ্ছেগতিবেগ বা এ্যাকশনের মূল কথা। বস্তুত, গতিবেগই জীবনের আনন্দকে ধারণ করে। বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক শ্লেগেল তাঁর 'Dramatic Literature গ্রন্থে লিখেছেন- 'Action is the true enjoyment of life, may, life itself. যা আমাদের চিত্তকে আন্দোলিত করে, তাতেই আমরা আনন্দ পাই। গতি বা এ্যাকশনে কেবল নড়াচড়া বা অগ্র-পশ্চাৎ গতি থাকলেই চলে না, তাতে অবস্থান্তর এবং পরিবর্তনশীলতাও থাকতে হবে। নাটকের গতি প্রথমত অভিনেতা অভিনেত্রীদের মঞ্চে আসা-যাওয়া এবং অঙ্গ-সঞ্চালনের মাধ্যমে ঘটে থাকে। পরিবেশের উপর নাটকের এ্যাকশন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে এ্যাকশন ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। নাটকের গতি অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন। গতি বা এ্যাকশনের মাধ্যমে নাটকের এই অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন পথযাত্রা অক্ষুণ্ন রাখা হয়। দৃশ্য বা অঙ্গ বিভাজনের সময় নাটকের গতিবেগ সাময়িকভাবে অদৃশ্য থাকে। কিন্তু নাট্যিক গতিতে তখনো আন্দোলিত হতে থাকে দর্শক-মন। বস্তুত, গতির আসল উৎস হলো দর্শকের মনোজগৎ। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নাটকে ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগ ফুটিয়ে তুলতে হয়। এ কারণে ঐতিহাসিক নাটকে যে ধরনের এ্যাকশন বা গতি ফুটিয়ে তোলা হয়, সামাজিক বা সাঙ্কেতিক নাটকে তা কার্যকর হতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ নাট্যসংঘাত কি?

উত্তর ॥ নাটকে গতিবেগ বা এ্যাকশন সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে(conflict) বা সংঘাত নির্মাণ। সংঘাত নাটকের প্রাণ। নাটকে যদি সংঘাত সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে শিল্প হিসেবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নাটকে সংঘাত নানাভাবে দেখা দেয়। গ্রীক নাটকে আমরা দেখি দৈবশক্তি বা নিয়তির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব বা সংঘাত বেধেছে। কখনো কখনো নাটকে সংঘাত দেখা দেয় দু গুচ্ছমানুষের মধ্যে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধই নাটকের প্রধান উপজীব্য। দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রের ক্রিয়া-ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নাট্যসংঘাত সৃষ্টি হয়। বিপরীতধর্মী দুই গুচ্ছমানুষের একগুচ্ছ'good` বা ভালোর প্রতীক। নাট্যসংঘাত যত তীব্র হয়, নাটক হিসেবে ততই তার সার্থকতা। সমাজশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিশক্তির দ্বন্দ্বের ফলেও নাটকে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে। নাটকে অন্য এক ধরনের সংঘাত দেখা যায়। কোন বহিরঙ্গ কারণে নয়, বরং চরিত্র অভ্যন্তরেই এই সংঘাতের বীজ উপ্ত হয়। বস্তুত, এই দ্বন্দ্বই আধুনিক নাটকের প্রধান দ্বন্দ্ব। প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, সমাজচেতনার সঙ্গে ব্যক্তিচেতনার, হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে কর্তব্যবোধের, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের স্বদেশ প্রেমের সঙ্গে ব্যক্তি অনুরাগের দ্বন্দ্ব চরিত্রের অভ্যন্তরে নিয়ত চলতে থাকে। চরিত্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্বই নাটকের মূল সংঘাত। যে কোন ধরনের নাটকেই এই সংঘাত সৃষ্টি করতে হয়।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি

- নাটকের আঙ্গিক বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- নাটকের উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

নাটকের আঙ্গিক ও উপাদান

আপনি ইতঃপূর্বেই জেনেছেন, মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি ভাব অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে নাটক। বস্তুত, সাহিত্যের অন্য যে সব শাখা রয়েছে, সেখানেও মানবজীবনের নানা দিক রূপায়িত হয়। তাহলে নাটকের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্য শাখার মৌল পার্থক্য কোথায়? মূল পার্থক্য হলো, নাটকের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতার সম্পর্ক সরাসরি ও প্রত্যক্ষ। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা মানুষ একাকী যখন ও যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ করতে পারে, কিন্তু নাটক উপভোগ করতে হয় নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে এবং সম্মিলিতভাবে। এ জন্যে অন্যান্য সাহিত্য শাখা থেকে নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল সম্পূর্ণ আলাদা এবং বিশেষ নিয়ম-নীতি দ্বারা সুনির্দিষ্ট।

প্রতিটি নাটকের মধ্যে চারটি প্রধান উপাদান থাকে। এগুলো হচ্ছে১. কাহিনী বা বিষয়, ২. চরিত্র, ৩. সংলাপ, এবং ৪. পরিবেশ। একজন নাট্যকারকে নাটক রচনার সময় এ-চারটি উপাদানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হয়।

প্রতিটি নাটকে একটি নির্দিষ্ট কাহিনী থাকে। মানবজীবন মূল অবলম্বন হলেও মানুষের সম্পূর্ণ জীবন নাটকে উপস্থাপিত হয় না। জীবনের বিশেষ কোন ঘটনা বা বিষয়কে অবলম্বন করে নাট্যকার নাটক রচনা করেন। নাট্যকারকে সব সময় মনে রাখতে হয় যে, নাটক নির্দিষ্ট একটি মঞ্চে অভিনেতা অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত হবে। তাই কাহিনীর মধ্যে এমন কিছু আনা যাবে না, যা মঞ্চে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এ-ছাড়া, নাটকের অভিনয় সাধারণত ৬০ থেকে ৯০ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে থাকে। তাই কাহিনী এতোটা বড় করা যায় না, যা অভিনীত হতে এর চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন নয়। এ কারণে একজন রাজা, একদল শ্রমজীবী মানুষ, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কিংবা পথভ্রষ্ট এক তরুণের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে বসলে তার বা তাদের সব কথা নাটকে বলা যায় না, বলতে হয় নির্বাচিত কিছু কথা, যা দিয়েই গড়ে ওঠে নাটকের কাহিনী। এ ক্ষেত্রে টেলিভিশনের সিরিজ নাটকগুলোকে ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সিরিজ নাটকে বিশাল এবং বিস্তৃত জীব কাহিনী উপস্থাপন করা সম্ভব, কেননা নাটক সেখানে ৬০ থেকে ৯০ মিটিনের সময়সীমায় বন্দী নয়। ইচ্ছা করলেই অনেক কথা সেখানে নিয়ে আসা সম্ভব।

এ্যারিস্টটলের মতে, নাটকের উপাদানগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রেই গণ্য বৃত্ত বা plot. নাটকের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অঙ্কে বিভক্ত হয়। এক একটি অঙ্কের মধ্যে নাটকীয় গতি এক একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীও যুক্ত হতে পারে। তবে মূল ঘটনাই যেন প্রাধান্য পায়, সেদিকে নাট্যকারকে সচেতন থাকতে হয়।

কাহিনীকে সাজাতে হলে চরিত্রের প্রয়োজন। কারণ বিশেষ বিশেষ চরিত্র ছাড়া নাটকের কাহিনী দাঁড়াবে কিভাবে? তাই নাট্যকারকে প্রথমেই কতিপয় চরিত্র নির্বাচন করতে হয়। নাটকে একটি প্রধান চরিত্র থাকে। প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করেই নাট্যঘটনা বিকশিত হয়। কিন্তু প্রধান চরিত্রতো একা একা কথা বলতে পারে না। তাই তার সঙ্গে সঙ্গে আসে আরও কিছু চরিত্র। এরা সবাই মিলে নাটকের কাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। প্রত্যেক নাটকেই দু'গুচ্ছচরিত্র থাকে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এবং বোঝেন, পৃথিবীর যে কোন সমস্যায় কমপক্ষে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ বিশেষ একটি কাজকে সমর্থন করে, অন্যপক্ষ করে তার বিরোধিতা। এ দু'পক্ষের দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনীতে চরিত্র বিকশিত হয়। ট্রাজেডির চরিত্র কেমন হবে সে সম্পর্কে এ্যারিস্টটল যা বলেছেন, তা মূলত সকল নাটকের চরিত্র সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তাঁর মতে, চরিত্রের থাকতে হবে নিম্নোক্ত গুণাবলি–

ক. নাটকের চরিত্রের মাঝে ভাল ও মন্দের সমাবেশ থাকবে;

খ. নাটকের চরিত্রকে হতে হবে যথাযথ;

গ. নাটকের চরিত্রকে হতে হবে বাস্তব;

ঘ. নাটকের চরিত্রকে হতে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নাটকের মধ্যে অনেক চরিত্র থাকতে পারে, কিন্তু নাটকের গতি প্রধানত একটি কি দুটি প্রধান চরিত্রকে কেমন করে বিকশিত হয়। প্রধান চরিত্রের উপরই নাটকের সার্থকতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই প্রধান চরিত্র রূপায়ণে নাট্যকারকে দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়।

কাহিনী আর চরিত্র তো পাওয়া গেল, এখনো কিন্তু নাটক হলো না। কারণ চরিত্রগুলো এখনো কথা বলতে পারছে না। কথা বলার জন্য চাই সংলাপ। সংলাপ কাহিনী ও চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনী বিকশিত হয়। বস্তুত সংলাপের মাধ্যমে তিনটি বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হয়। এগুলো হচ্ছে–

ক. নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রমাণ করার জন্য সংলাপ;

খ. চরিত্রসমূহের প্রকাশ ও বিকাশের জন্য সংলাপ;

গ. নাটকের দ্বন্দ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সংলাপ।

নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, সংলাপই মূলত নাটকের প্রাণ। সংলাপের মাধ্যমেই নাট্য পরিস্থিতি নির্মিত হয়। সংলাপ ব্যর্থ হলে, নাট্যরস ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। গল্প বা উপন্যাসে বর্ণনার অবকাশ আছে, সেখানে গল্পকার বা ঔপন্যাসিকও কথা বলতে পারেন। কিন্তু নাটকে সে সুযোগ থাকে না। নাট্যকারকে এখানে সংলাপের মাধ্যমেই সব কাজ করতে হয়। সংলাপের মাধ্যমেই যেহেতু নাট্যকাহিনী বিকশিত হয়, তাই সংলাপের ভাষা কেবল চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী হলেই চলে না। ভাষার মধ্য দিয়ে আবেগ দ্বন্দ্ব, উৎকণ্ঠা প্রভৃতিও ফুটিয়ে তুলতে হয়। সংলাপের ভাষা কেবল ভাব প্রকাশকই নয়, গতিসঞ্চারীতও। সেজন্য সংলাপের শব্দপ্রয়োগ, বাক্যবিন্যাস, বিভিন্ন বাক্যের পারাররিক সংযোগ ইত্যাদিকেও নাট্যকারকে সতর্ক ও যত্নবান হতে হয়। সংলাপের ভাষা অবিকল বাস্তব হলে চলে না। সংলাপের ভাষা হলো শিল্পের ভাষা। তাই সংলাপের ভাষাকে একটু সাজিয়ে, বর্ণ ও সুরের সমাবেশে ফুটিয়ে তুলতে হয়। এ প্রসঙ্গে এ্যারিস্টটলের অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন– "The perfection of Diction is for it to be at once clear and not mean" সাধারণ এবং অসাধারণ ভাষা ব্যবহারেই নাটকের সংলাপ নিখুঁত হয়ে ওঠে।

নাটকের সংলাপ কখনো গদ্য এবং কখনও বা পদ্যরীতি অবলম্বন করে। নাটকের বিষয়বস্তু এবং নাট্যরসের দাবি অনুযায়ী উপরের যে কোন একটি রীতি সংলাপে ব্যবহৃত হয়। গ্রীক নাটকের ভাষায় পদ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে, শেক্সপীয়ারের নাটকেও পদ্যরীতির ব্যবহার ঘটেছে। কিন্তু আধুনিক কালে আমরা নাটকের সংলাপে সাধারণত গদ্যভাষার ব্যবহার লক্ষ করি। তবে একালেও বিষয়ের প্রয়োজনে অনেক নাটকের সংলাপে পদ্যরীতির ব্যবহার লক্ষণীয়।

নাটকের কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপকে অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নাট্যকার পরিবেশ তৈরি করেন। নাচ, গান, শব্দ সংযোজন, আলোকবিন্যাস, কাহিনী অনুযায়ী দৃশ্য ও মঞ্চসজ্জা এবং মঞ্চনির্মাণ কৌশলের মাধ্যমে নাটকের পরিবেশ নির্মাণ করা হয়। পরিবেশ যথাযথ না হলে নাটকের শিল্পগুণ ক্ষুণ্ন হয়। তাই পরিবেশ নির্মাণের প্রতি নাট্যকারকে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। নাট্যকারের এমন কোন পরিবেশ নির্মাণ করা উচিত নয়, যা মঞ্চে উপস্থাপন করা অসম্ভব।

উপরের চারটি উপাদান মিলেই গড়ে ওঠে একটি নাটক। প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, উপর্যুক্ত চারটি উপাদানের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বড় বা প্রধান/না, কোন উপাদানকেই প্রধান বলবো না- সবগুলো উপাদান মিলেই গড়ে ওঠে একটি নাটক- এটিই আমাদের জানার কথা। তবে এখানে জেনে রাখা ভালো, এক এক যুগে এক একটি উপাদান প্রধান হয়ে দেখা দেয়। সেদিক থেকে কাহিনী এবং চরিত্রের স্থানই উচ্চে। গ্রীক নাটকে কাহিনীর প্রাধান্য বেশি, পক্ষান্তরে শেক্সপীয়রের নাটকে দেখি চরিত্রের প্রাধান্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'নাটকের আঙ্গিক ও উপাদান' সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

২. নাটকের কাহিনী বা বিষয় বলতে আপনি কি বুঝেন?

৩. "নাটকের অন্যতম উপাদান চরিত্র"- কথাটির অর্থ কি?

৪. নাটকের সংলাপ কেমন হওয়া উচিত?

৫. 'পরিবেশ' বলতে কি বুঝেন?

উত্তর

প্রশ্ন ঃ নাটকের কাহিনী বা বিষয় বলতে আপনি কি বুঝেন?

উত্তর ॥ প্রতিটি নাটকের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কাহিনী থাকে। মানবজীবন মূল অবলম্বন হলেও মানুষের সম্পূর্ণ জীবন নাটকে উপস্থাপিত হয় না। জীবনের বিশেষ কোন ঘটনা বা বিষয়কে অবলম্বন করে নাট্যকার নাটক রচনা করেন। নাট্যকারকে সব সময় মনে রাখতে হয় যে, নাটক নির্দিষ্ট একটি মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত হবে। তাই কাহিনীর মধ্যে এমন কিছু আনা যাবে না, যা মঞ্চে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এ-ছাড়া, নাটকের অভিনয় সাধারণত ৬০ থেকে ৯০ মিনিটের মধে শেষ হয়ে থাকে। তাই কাহিনী এতোটা বড় করা যায় না, যা অভিনীত হতে এর চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এ কারণে একজন রাজা, একদল শ্রমজীবী মানুষ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কিংবা পথভ্রষ্ট এক তরুণের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে বসলে তার বা তাদের সব কথা নাটকে বলা যায় না, বলতে হয় নির্বাচিত কিছু কথা, যা দিয়েই গড়ে ওঠে নাটকের কাহিনী। নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে কখনো কখনো উপকাহিনী যুক্ত হয়। উপকাহিনীরও একটি স্বতন্ত্র কাহিনীরূপ থাকে। উপকাহিনী যাতে মূল কাহিনীকে ছাড়িয়ে না যায়, সেদিকে নাট্যকারকে খুব সতর্ক থাকে হয়। নাটকের কাহিনী কতগুলো পর্বে বিন্যাস করতে হয়। এক একটি পর্ব এক একটি অঙ্কে বিন্যাস করা হয়। অঙ্কগুলো আবার কতগুলো দৃশ্যে বিভক্ত থাকে, কখনো বা এক অঙ্কেও নাটক রচিত হয়।

প্রশ্ন ঃ নাটকের সংলাপ কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর ॥ নাটকের কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টির প্রধান উপায় হল সংলাপ। সংলাপের মাধ্যমে যেমন কাহিনী ও চরিত্র বিকশিত হয়, তেমনি তার মাধ্যমে নাট্যকারের বক্তব্য ও জীবনার্থও প্রকাশিত হয়। সংলাপ কাহিনী ও চরিত্রকে সুারষ্ট করে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনী বিকশিত হয়। বস্তুত, সংলাপের মাধ্যমে তিনটি বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হয়। এগুলো হচ্ছে-

ক. নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রমাণ করার জন্য সংলাপ;

খ. চরিত্রসমূহের প্রকাশ ও বিকাশের জন্য সংলাপ;

গ. নাটকের দ্বন্দ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সংলাপ।

নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, সংলাপই মূলত নাটকের প্রাণ। সংলাপের মাধ্যমেই নাট্য পরিস্থিতি নির্মিত হয়। সংলাপ ব্যর্থ হলে, নাট্যরস ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। ছোটগল্প বা উপন্যাসে বর্ণনার অবকাশ আছে, সেখানে গল্পকার বা ঔপন্যাসিকও কথা বলতে পারেন। কিন্তু নাটকে সে সুযোগ থাকে না। সংলাপের মাধ্যমেই সব উদ্দেশ্য এখানে সাধন করতে হয় নাট্যকারকে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- নাটকের গঠনকৌশল আলোচনা করতে পারবেন।
- নাটকের ত্রিমাত্রিক ঐক্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- নাটকের পঞ্চ-সন্ধি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

নাটকের গঠনকৌশল

নাটকের গঠনকৌশল নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন গ্রীক মনীষী এ্যারিস্টটল। প্রাচীন গ্রীক নাটকগুলো পরীক্ষা করে নাটকের সংগঠন এবং শৈলী সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর মতে, তিনটি বিষয়ের ঐক্যই একটি নাটকের গঠনকৌশলের প্রধান ভিত্তি। এই ঐক্যত্রয় নিম্নরূপ–

১. কালের ঐক্য;

২. স্থানের ঐক্য;

৩. ঘটনার ঐক্য।

কালের ঐক্য বলতে আমরা বুঝি, নাটক যত সময় মঞ্চে অভিনীত হবে, সে সময়ের মধ্যে যা কিছু ঘটা সম্ভব, নাটকে কেবল তা-ই ঘটানো যাবে। অর্থাৎ ঘটনার বিশ্বস্ততা এবং মঞ্চ-যোগ্যতা নাট্যকারকে অক্ষুণ্ন রাখতে হয়। কালের ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে এ্যারিস্টটল বলেছেন বা ২৪ ঘন্টার মধ্যে নাট্যকাহিনীকে সীমাবদ্ধ হতে হবে। তবে এ তত্ত্ব আধুনিক কালের নাটকে সর্বাংশে প্রযোজ্য নয়।

স্থানের ঐক্য হলো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাট্যচরিত্রসমূহ যতটা স্থান পরিবর্তন করতে পারে, নাটকে ততটাই দেখানো যাবে। এর চেয়ে বেশি স্থানান্তর নাটকের জন্য অপ্রয়োজনীয়। নাটকে এমন কোন স্থানের উল্লেখ থাকতে পারবে না, যেখানে নাট্য নির্দেশিত সময়ের মধ্যে চরিত্রসমূহ যাতায়াত করতে পারে না।

ঘটনার ঐক্য হলো, নাটকে এমন কোন ঘটনা দেখানো যাবে না, যা মূল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। এ্যারিস্টটলের মতে, অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ নাটকের শিল্পগুণ নষ্ট করে। ঘটনার ঐক্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ লিখেছেন "নাটকে এমন কোন দৃশ্য বা চরিত্র সমাবেশ থাকিবে না, যাহাতে মূল সুর ব্যাহত হইতে পারে। সমস্ত চরিত্র ও দৃশ্যই নাটকের মূল বিষয় ও সুরের পরিপোষক রূপে প্রদর্শিত হওয়া চাই .....।"

উপরের তিন ধরনের ঐক্যের মধ্যে এ্যারিস্টটল তাঁর On the Art of Poetry গ্রন্থে ঘটনার ঐক্যের উপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, ঘটনার ঐক্যের প্রতি নাট্যকারকে খুবই মনোযোগী থাকতে হয়। আধুনিক কালে এই ত্রিমাত্রিক ঐক্যের সঙ্গে নতুন এক প্রকার ঐক্য আমরা কোন কোন নাটকে লক্ষ করি। একে বলা হয় চরিত্রের একত্ব বা Unity of charade। একটি মাত্র রিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নাটকেই আমরা এই ঐক্য দেখতে পাই। এ ধরনের নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিনি পয়সার ভোজ', নরুল মোমেনের 'নেমেসিস', আব্দুল্লাহ আল মামুনের 'কোকিলারা', ইউজিন ও নীল-এর 'দি ব্রেক ফাস্ট', জাঁ ককতুর 'দি হিউম্যান ভয়েস' প্রভৃতি নাটকের নাম উল্লেখ করতে পারি।

মূল নাট্যকাহিনীকে এ্যারিস্টটল আদি, মধ্য এবং অন্ত্য– এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। একই সঙ্গে ঐ তিনটি পর্যায়ের মধ্যে তিনি অখণ্ড সমন্বয়ের কথাও বলেছেন। নাট্যকাহিনী বিকাশের ক্রমকে অনুসরণ করেই আদি, মধ্য ও

অন্ত্য পর্ব বিবেচনা করা হয়। খুব সংক্ষেপে এবং সহজে আমরা বলতে পারি– নাট্যসমস্যার উপস্থাপনা, চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন এবং মূল সমস্যায় অনুপ্রবেশের পূর্বাবস্থা হলো আদি পর্যায়। মধ্য পর্যায়ে নাট্যদ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং মূল সঙ্কটের একটি চূড়ান্ত নাট্যমুহূর্ত নির্মিত হয়। অন্ত্য-পর্বে অতি দ্রুত কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। এ্যারিস্টটলের মতে, নাট্যকাহিনীর এই তিন পর্বের মধ্যে গভীর ঐক্য ও সমন্বয় থাকা প্রয়োজন।

এখানে একটি কথা আপনার মনে রাখা প্রয়োজন, উপরের তিনটি ঐক্যের মধ্যে স্থান ও কালের ঐক্য মেনে নিয়ে নাটক রচনা রীতিমতো দুরূহ কাজ। স্থান ও কালের ঐক্য মেনে চললে নাটকের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই আধুনিক কালের নাটকে আপনি ঐ দু'ধরনের ঐক্য তেমন লক্ষ করবেন না। এমন কি উইলিয়ম শেক্সপীয়রও তাঁর নাটকে স্থান ও কালের ঐক্য সর্বদা মেনে চলেন নি। তবে ঘটনার ঐক্য নাটকের জন্য অনিবার্য শর্ত। ঘটনার ঐক্য বিনষ্ট হলে নাটক কিছুতেই সার্থক হবে না। এজন্য, পূর্বেই উল্লেখিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে কাল, স্থান ও ঘটনার ঐক্যনীতি অনুসৃত হয় নি। ভবভূতির 'মহাবীর চরিত্র' নাটকে আমরা বার বছরের কাহিনীধারা লক্ষ করি; অথচ কালের ঐক্যনীতিতে এ্যারিস্টটল বলেছেন, নাটকে কেবল চব্বিশ ঘন্টার কাহিনী দেখানো যাবে। মোটকথা, বিষয়ের প্রয়োজনেই নাট্যকারেরা নির্বাচন করে নেন, তাঁরা কতটুকু ও কোন মাত্রায় ত্রয়ী ঐক্যনীতি অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা হলো, তাঁরা ঐক্যনীতি যেভাবে এবং যতটুকুই মেনে চলেন না কেন, দেখতে হবে মূল নাট্যরস যেন কিছুতেই বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

একটি নাটকের গঠনকে প্রধানত পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। এই পর্বগুলো নিম্নরূপ–

১. কাহিনীর আরম্ভ Exposition [মুখ],

২. কাহিনীর ক্রমব্যাপ্তি - Rising action [প্রতিমুখ]

৩. উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব climax [গর্ভ]

৪. গ্রন্থিমোচন Falling action [বিমর্ষ]

৫. যবনিকাপাত Conclusion বা Catastrophe

আপর্যুক্ত পাঁচটি পর্যায়কে অবলম্বন করেই রচিত হয় পঞ্চাঙ্ক নাটক। এক একটি পর্যায় নিয়ে লেখা হয় এক একটি অঙ্ক। এ্যারিস্টটলের মতে, পঞ্চাঙ্ক নাটকই হচ্ছেআদর্শ নাটক। নাটকের প্রথম অঙ্কে আখ্যানভাগের সূচনা এবং নাট্যিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিত বর্ণিত হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে আখ্যানের জটিলতা এবং নাট্যদ্বন্দ্ব বিস্তার লাভ করে। তৃতীয় অঙ্কে বর্ণিত হয় ঘটনার ঘনীভূত অবস্থা এবং চরম নাট্যোৎকর্ষ। এখানেই নাট্যদ্বন্দ্বের চূড়ান্ত রূপ বর্ণিত হয়। চতুর্থ অঙ্কে আস্তে আস্তে নাট্য-জটিলতার জট খুলতে থাকে। পঞ্চম অঙ্কে বর্ণিত হয় নাট্যকাহিনীর সমাপ্তি বা উপসংহার। একটি পঞ্চাঙ্ক নাটকের কাহিনীধারা অনুসরণ করলে উপর্যুক্ত পঞ্চাঙ্ক নাটকের বিভাজন অনুধাবন করা আপনার কাছে সহজ হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটক 'সাজাহান'-এর কাহিনীক্রম বিশ্লেষণ করতে পারি। 'সাজাহান' নাটকের অঙ্ক-বিভাজন নিম্নরূপ–

প্রথম অঙ্ক ঃ দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য সাজাহানের পুত্রদের মাঝে বিদ্রোহ। বিদ্রোহ দমন করে বিজয়ী ঔরঙ্গজীব আগ্রায় প্রবেশ করে বৃদ্ধ পিতা সাজাহানকে বন্দী করেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ ঔরঙ্গজীব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মোরাদকে বন্দী করেন। পরাজিত দারা রাজপুতানার মরুভূমিতে সপরিবারে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন। ঔরঙ্গজীব কর্তৃক সুজার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ।

তৃতীয় অঙ্ক ঃ গুজরাটের সুবেদার সাহাবাজের দারার পক্ষ অবলম্বন। ঔরঙ্গজীব যশোবন্ত সিংহকে গুর্জরের সুবেদারির লোভ দেখিয়ে দারার পক্ষ থেকে সরিয়ে আনা।

চতুর্থ অঙ্ক ঃ পরাজিত ও ধৃত দারাকে ঔরঙ্গজীব কারাদণ্ড প্রদান করেন। জিহন খাঁ দারার ছিন্নমুণ্ড এনে ঔরঙ্গজীবকে উপহার প্রদান করেন।

পঞ্চম অঙ্ক ঃ দারার পুত্র সোলেমান বন্দী হলেন। সুজা আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দারার মৃত্যুতে সাজাহানের উম্মাদ অবস্থা। অনুতাপ দগ্ধ ঔরঙ্গজীব পিতা সাজাহানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বৃদ্ধ পিতা মাতৃহীন পুত্রকে ক্ষমা করলেন এবং এভাবে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

এ্যারিস্টটল পঞ্চাঙ্ক নাটকের কথা বললেও, আধুনিক কালে উপর্যুক্ত পাঁচটি পর্যায়, পাঁচের চেয়ে কম অঙ্কে ধারণ করেও নাটক রচিত হচ্ছে। আধুনিক নাট্যকারেরা তিন অঙ্কে নাটক রচনা করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কখনো বা এক অঙ্কের পরিসরেই পাঁচটি পর্যায়কে ধারণ করে উৎকৃষ্ট নাটক লেখা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' এবং নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস' নাটকের কথা বলতে পারি। এক অঙ্ক এবং এক দৃশ্যে রচিত হলেও উপর্যুক্ত নাট্যদ্বয়ে অদৃশ্য পঞ্চসন্ধি সহজেই নির্দেশ করা যায়।

নাটকের মূল লক্ষ্য হলো নাট্যকাহিনীর বিকাশ ও চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নির্মাণ। এদিকে লক্ষ রেখেই নাট্যকার তাঁর নাটকের সংগঠন নির্মাণ করেন। অঙ্ক ভাগের গাণিতিক হিসেব দিয়ে জীবনের হিসেব সর্বদা মেলে না। তাই সৃজনশীর নাট্যকার প্রায়শই নতুন নতুন সংগঠন-শৈলী নির্মাণ করে নাট্যসাহিত্যের বিকাশের ধারা অক্ষুণ্ন রাখেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে নাটকের গঠনকৌশল আলোচনা করুন।

২. নাটকের ত্রিমাত্রিক ঐক্য বলতে আপনি কি বুঝেন? আলোচনা করুন।

৩. নাটকের পঞ্চসন্ধি ব্যাখ্যা করুন।

৪. এ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী নাটকের ত্রয়ী পর্ব কি কি? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ নাটকের ত্রিমাত্রিক ঐক্য বলতে আপনি কি বুঝেন? আলোচনা করুন।

উত্তর ॥ নাটকের ত্রিমাত্রিক ঐক্য নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন গ্রীক মনীষী এ্যারিস্টটল। প্রাচীন গ্রীক নাটকগুলো পরীক্ষা করে নাটকের সংগঠন এবং শৈলী সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর মতে, তিনটি বিষয়ের ঐক্যই একটি নাটকের গঠনকৌশলের প্রধান ভিত্তি। এই ঐক্যত্রয় নিম্নরূপ–

১. কালের ঐক্য বা,

২. স্থানের ঐক্য বা এবং

৩. ঘটনার ঐক্য বা।

কালের ঐক্য বলতে আমরা বুঝি, নাটক যত সময় মঞ্চে অভিনীত হবে, সে সময়ের মধ্যে যা কিছু ঘটা সম্ভব, নাটকে কেবল তা-ই ঘটানো যাবে। অর্থাৎ ঘটনার বিশ্বস্ততা এবং মঞ্চ যোগ্যতা নাট্যকারকে সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলতে হয়। কালের ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে এ্যারিস্টটল বলেছেন, ২৪ ঘন্টার মধ্যে নাট্যকাহিনীকে সীমাবদ্ধ হতে হবে। তবে এ-তত্ত্ব আধুনিক কালের নাটকে অনুসৃত হয় না বললেই চলে।

স্থানের ঐক্য হলো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাট্যচরিত্রসমূহ যতটা স্থান পরিবর্তন করতে পারে, নাটকে ততটাই দেখানো যাবে। এর চেয়ে বেশি স্থানান্তর নাটকের জন্য অপ্রয়োজনীয়। নাটকে এমন কোন স্থানের উল্লেখ থাকবে না, যেখানে নাট্য-নির্দেশিত সময়ের মধ্যে চরিত্রসমূহ যাতায়াত করতে পারে না।

ঘটনার ঐক্য হলো, নাটকে এমন কোনো ঘটনা দেখানো যাবে না, যা মুল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয বলে মনে হয়। এ্যারিস্টটলের মতে, অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ নাটকের শিল্পগুণ নষ্ট করে। ঘটনার ঐক্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ লিখেছেন– "নাটকে এমন কোনো দৃশ্য বা চরিত্র সমাবেশ থাকিবে না, যাহাতে মূল সুর ব্যাহত হইতে পারে। সমস্ত চরিত্র ও দৃশ্যই নাটকের মূল বিষয় ও সুরের পরিপোষক রূপে প্রদর্শিত হওয়া চাই .....।"

উপরের তিন ধরনের ঐক্যের মধ্যে এ্যারিস্টটলে তাঁর গ্রন্থে ঘটনার ঐক্যের উপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তার মতে, ঘটনার ঐক্যের প্রতি নাট্যকারকে খুবই মনোযোগী থাকতে হয়। আধুনিক কালে এই ত্রিমাত্রিক ঐক্যের সঙ্গে নতুন এক প্রকার ঐক্য আমরা কোন কোন নাটকে লক্ষ করি। একে বলা হয় চরিত্রের একত্ব। একটি মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নাটকেই আমরা এই ঐক্য দেখতে পাই।

এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, উপরের তিনটি ঐক্যের মধ্যে স্থান ও কালের ঐক্য মেনে নিয়ে নাটক রচনা রীতিমতো দুরূহ কাজ। স্থান ও কালের ঐক্য মেনে চললে নাটকের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই আধুনিক কালের নাটকে এই দুই ধরনের ঐক্য তেমন লক্ষ করা যায় না। এমন কি উইলিয়ম শেক্সপীয়রও তাঁর নাটকে স্থান ও কালের ঐক্য সর্বদা মেনে চলেন নি। তবে ঘটনার ঐক্য নাটকের জন্য অনিবার্য শর্ত। ঘটনার ঐক্য বিনষ্ট হলে নাটক কিছুতেই সার্থক হবে না। এজন্য, ঘটনার ঐক্যকেই এ্যারিস্টটল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা করেছেন।

বিষয়ের প্রয়োজনেই নাট্যকারেরা নির্বাচন করে নেন, তাঁরা কতটুকু ও কোন মাত্রায় উপর্যুক্ত ত্রয়ী ঐক্যনীতি অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা হলো, তাঁরা ত্রয়ী ঐক্যনীতি যেভাবে এবং যতটুকু মেনে চলেন না কেন, দেখতে হবে মূল নাট্যরস যেন কিছুতেই বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

প্রশ্ন ঃ এ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী নাটকের ত্রয়ী পর্ব কি কি? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ॥ মূল নাট্যকাহিনীকে এ্যারিস্টটল আদি, মধ্য এবং অন্ত্য এই তিন পর্বে বিভক্ত করেছেন। নাটকের কাহিনীকে তিনটি পর্বে বিভক্তির কথা বললেও, একই সঙ্গে ঐ তিন তিনটি পর্বে মধ্যে তিনি অখণ্ড সমন্বয়ের কথাও বলেছেন। নাট্যকাহিনী বিকাশের ক্রমকে অনুসরণ করেই আদি, মধ্য ও অন্ত্য পর্ব বিবেচনা করা হয়। খুব সংক্ষেপে এবং সহজে আমরা বলতে পারি– নাট্যসমস্যার উপস্থাপনা, চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন এবং মূল সমস্যায় অনুপ্রবেশের পূর্বাবস্থা হলো আদি পর্যায়। মধ্য পর্যায়ে নাট্যদ্বন্দ্ব ঘণীভূত হয়ে ওঠে এবং মূল সঙ্কটের একটি চূড়ান্ত নাট্যমুহূর্ত নির্মিত হয়। অন্ত্য পর্বে অতি দ্রুত কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ্যারিস্টটলের মতে, নাট্যকাহিনীর তিনটি পর্বের মধ্যে গভীর ঐক্য ও সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। তিনটি পর্বের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় ব্যাহত হলে নাটকের শৈল্পিক সিদ্ধি বিনষ্ট হয়ে যায়। তিনটি পর্ব মিলিয়ে একটি জৈব-ঐক্য কাঠামো নির্মাণই একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের প্রধান কাজ বলে এ্যারিস্টটল মত প্রকাশ করেছেন।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- নাটকের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নাটকের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

নাটকের শ্রেণীবিভাগ

আপনি নিশ্চয়ই অনেক নাটক দেখেছেন; কখনো রেডিওতে নাটক শুনেছেন, কখনো টেলিভিশনে নাটক উপভোগ করেছেন, কখনো বা বিশেষ কোন নাট্যগ্রন্থ পাঠ করেছেন। আপনার দেখা শোনা বা পাঠ করা সবগুলো নাটকই কি একই ধরনের? নিশ্চয়ই নয়। কোন নাটক দেখে আপনি হেসেছেন, কখনো কেঁদেছেন, কখনো পেয়েছেন আনন্দ, কখনো বা বেদনায় হয়েছেন বিমর্ষ। কোন কোন নাটকে আপনি সমাজের বিশেষ কোন ঘটনা বা চিত্র দেখেছেন; কোথাও বা দেখেছেন ঐতিহাসিক কোন চরিত্রের বিজয়কাহিনী কিংবা তার পতন ও পরাভবের ইতিহাস। এসব কারণে নাটককে আমরা কতগুলো ভাগে বিভক্ত করতে পারি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণেই নাটককে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারি; আবার রসের বিচারে নাটককে ট্র্যাজেডি, কমেডি, ফার্স ইত্যাদি ভাগে বিন্যস্ত করতে পারি। বিভিন্ন ধরনের মাপকাঠির আলোকে নাটককে যে সব শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব, তার একটা ছক নিচে দেওয়া হলো–

মাপকাঠি	নাটকের শ্রেণীবিভাগ				
ভাব অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	ক্ল্যাসিকাল	র‍্যোমান্টিক	বাস্তববাদী	-	-
বিষয় অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	পৌরাণিক	ঐতিহাসিক	সামাজিক	চরিত্রমূলক	-
রস অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	ট্রাজেডি	কমেডি	মেলোড্রামা	ট্র্যাজিকমেডি	প্রহসন
উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	সমস্যামূলক	রূপকনাট্য	সাঙ্কেতিক	অভিব্যক্তিবাদী	অ্যাবসার্ড
রূপ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	লোকনাট্য	গীতিনাট্য	নৃত্যনাট্য	মহাকাব্যিক	পথনাটক
আয়তন অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	পাঁচ অঙ্কের নাটক	চার অঙ্কের নাটক	তিন অঙ্কের নাটক	দুই অঙ্কের নাটক	এক অঙ্কের নাটক

আপনি ইচ্ছা করলে আরো কিছু মাপকাঠি প্রয়োগ করে নাটককে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারেন। যেমন, প্রচারমাধ্যম বা অভিনয় স্থল অনুসারে আপনি নাটককে তিন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারেন– বেতার নাটক, টেলিভিশন নাটক, মঞ্চ নাটক ইত্যাদি।

উপরের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ট্র্যাজেডি নাটক সম্পর্কে এখানে বিস্তৃতভাবে আপনার জানা প্রয়োজন। কেননা, আপনার পাঠ্যসূচিভুক্ত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা একটি ট্র্যাজেডি নাটক। ট্র্যাজেডি হিসেবে 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' কতটুকু সার্থক, তা বিবেচনা করতে হলে ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্বে পরাভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনীকে সাধারনত ট্র্যাজেডি বলা হয়। এ জাতীয় নাটকে নায়কের বিশেষ কোন মানস প্রবণতা কিংবা ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা সামান্য ভুল-ভ্রান্তির জন্য জীবনে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় দেখা দেয়; কখনো বা দৈব এবং অদৃষ্ট পীড়িত হয়ে তাকে মেনে নিতে হয় করুণ পরিণতি। ট্র্যাজেডি নাটকের নায়ক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হন এবং অবশেষে তার জীবনে নেমে আসে ভয়াবহ করুণ পরিণতির। গ্রীক মনীষী এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে লিখেছেন–

Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions.

এ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞার্থ থেকে ট্র্যাজেডি নাটকের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা শনাক্ত করতে পারি–

১. ট্র্যাজেডি কোন গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিজাত কর্মের অনুকরণ। এ ধরনের নাটকের ঘটনা হবে সুগভীর ও পূর্ণ বয়ব।

২. ট্র্যাজেডিতে কোন সকর্মক জীবন ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়।

৩. ভাবগৌরবে, শব্দচয়নে এবং সঙ্গীত-সংযোগে ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গ প্রসাধিত হয়।

৪. নাটকীয়, বিচিত্র ঘটনাধারা হবে একক পরিণামমুখী (unity of action)।

৫. ট্র্যাজেডি ঘটনাক্ষ, বর্ণনাক্ষ কাহিনী নয়।

৬. ট্র্যাজেডি দর্শনে দর্শকচিত্তে করুণা ও ভীতি সঞ্চারিত হয় এবং অন্তিমে এর নিরসন (Purgation) ঘটে।

ট্র্যাজেডি মানবজীবনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত আলোড়িত করে দর্শকচিত্ত করুণা ও ভীতিতে পূর্ণ করে দেয়। এখানে মানবজীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা ও অসহায়তার কথা ফুটে ওঠে সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিই জীবনের প্রতি বিদ্বেষ কিংবা বীতারৃহার পরিচয়ব্যঞ্জক নয়। ট্র্যাজেডি দর্শনে মানুষ তার সম্ভাবনার কথা জানতে পারে। তাই ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা থাকলেও, ট্র্যাজেডি দেখে মানুষ আনন্দ পায়।

নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ

খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকেই গ্রীস দেশে নাট্যচর্চার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা জানা যায়। পেরিক্লিসের গ্রীসে এবং পরবর্তীকালে এলিজাবেথের ইংল্যান্ডে নাট্যচর্চায় ব্যাপক সমৃদ্ধি এসেছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষেও সংস্কৃত নাটক খুব সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই নাট্যচর্চা আছে। আদিকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিখ্যাত নাটক ও তাঁর রচয়িতাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

নাট্যকার	সময়কাল	দেশ	প্রধান নাটকের নাম
ইসকাইলাস	খ্রি.পূ. ৫২৫-খ্রি.পূ. ৪৫৬	গ্রীস	প্রমিথিউস বাউন্ড
সফোক্লিস	খ্রি.পূ.৪৯৬-খ্রি.পূ. ৪০৬	গ্রীস	দি কিং ইডিপাস
ইউরিপিডিস	খ্রি.পূ.৪৮৪-খ্রি.পূ.৪০৬	গ্রীস	ইলেকট্রা
এ্যারিস্টোফেনিস	খ্রি.পূ.৪৪৮-খ্রি.পূ.৩৪৮	গ্রীস	দি ফ্রগস্
সেনেকা	খ্রি.পূ.৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দ	ইতালি	ফিয়েড্রা
ভবভূতি	খ্রিস্টীয় ২য় শতক	ভারত	স্বপ্ন-বাসবদত্তা
কালিদাস	খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতক	ভারত	অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্
শূদ্রক	খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক	ভারত	মৃচ্ছকটিকম্
শেক্সপীয়র	১৫৬৪-১৬১৬	ইংল্যান্ড	হ্যামলেট, ম্যাকবেথ
মলিয়ের	১৬২২-১৬৭৩	ফ্রান্স	লে বুর্জোয়া
রাসিন	১৬৩৯-১৬৯৯	ফ্রান্স	এ্যান্ডোমেকি
গ্যেটে	১৭৪৯-১৮৩২	জার্মানি	ফাউস্ট
ইবসেন	১৮২৮-১৯০৬	নরওয়ে	দি ডলস্ হাউস
স্ট্রীন্ডবার্গ	১৮৪৯-১৯১২	সুইডেন	দি ড্রিম প্লে
অস্কার ওয়াইল্ড	১৮৫৬-১৯০০	ইংল্যান্ড	সালোমি
বার্ণার্ড শ'	১৮৫৬-১৯৫০	ইংল্যান্ড	ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান
চেখভ	১৮৬০-১৯০৪	রাশিয়া	দি চেরি অরচার্ড
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৬১-১৯৪১	ভারতবর্ষ	বিসর্জন, রক্তকরবী
ইউজিন ও'নীল	১৮৮৮-১৯৩৫	আমেরিকা	দি এম্পেয়ার জোনস্
লোরকা	১৮৯৮-১৯৩৬	স্পেন	ব্লাড ওয়েডিং
ব্রেষ্ট	১৮৯৮-১৯৫৬	জার্মানি	মাদার কারেজ
বুদ্ধদেব বসু	১৯০৮-১৯৭৪	ভারতবর্ষ	তপস্বী ও তরঙ্গিনী
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	১৯২২-১৯৭১	বাংলাদেশ	তরঙ্গ-ভঙ্গ

উপরের তালিকা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নাটকের বিকাশ ও প্রধান প্রধান নাট্যকার সম্পর্কে আপনি ধারণা লাভ করতে পারবেন। উপর্যুক্ত তালিকার বাইরে আলো অনেক নাট্যকার আছেন। কিন্তু পরিসরের কথা বিবেচনা করে আমরা তাঁদের কথা উল্লেখ করিনি। আপনি মনে করলে, এই তালিকার সঙ্গে আরো কিছু নাম যুক্ত করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. নাটকের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
২. বিষয় অনুসারে নাটককে কয়ভাগে বিভক্ত করা যায়? বিভাগগুলোর পরিচয় দিন।
৩. নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।
৪. ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার্থ প্রদান করুন। ট্র্যাজেডি সম্পর্কে এ্যারিস্টটলের ধারণার পরিচয় দিন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ বিষয় অনুসারে নাটককে কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়? বিভাগগুলোর পরিচয় দিন।

উত্তর ॥ বিভিন্ন মাপকাঠির আলোকে নাটককে নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। বিষয় অনুসারে আমরা নাটককে প্রধান চারটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। এই বিভাগগুলো নিম্নরূপ–

১. পৌরাণিক নাটক
২. ঐতিহাসিক নাটক
৩. সামাজিক নাটক
৪. চরিতমূলক নাটক

পৌরাণিক নাটক ঃ পৌরাণিক কোন কাহিনী বা চরিত্রকে কেন্দ্র করে যখন কোন নাটক রচিত হয়, তখন তাকে পৌরাণিক নাটক বলে। রামায়ন, মহাভারত, ভাগবত পুরাণ বা অন্য কোন ধর্মমূলক কাহিনী অবলম্বনে পৌরাণিক নাটক লিখিত হয়। পৌরাণিক কোন কাহিনী বা চরিত্রকে সমকালীন জীবন ও চিন্তার সঙ্গে একাত্ম করার মধ্যেই এ ধরনের নাটকের সার্থকতা নিহিত। Byron এর The Four P'S গিরিশচন্দ্রের 'জনা', অমৃতলালের 'হরিশচন্দ্র', দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা, মন্মথ রায়ের 'কারাগার ইত্যাদি পৌরাণিক নাটকের উদাহরণ।

ঐতিহাসিক নাটক ঃ অতীতের কোন ঘটনা বা ইতিহাসের কোন চরিত্র অবলম্বনে যখন নাটক লিখিত হয়, তাকে ঐতিহাসিক নাটক বলে। এ ধরনের নাটকে নাট্যকারকে ঐতিহাসিক সত্য অক্ষুণ্ন রাখতে হয়, তবে নাটকের প্রয়োজনে তিনি একাধিক কল্পিত চরিত্র বা ঘটনার অবতারণা করতে পারেন। ঐতিহাসিক ঘটনাকে বর্তমানের মানবভাগ্যের সঙ্গে একাত্মকরে নেওয়ার মধ্যেই এ জাতীয় নাটকের সার্থকতা নিহিত। শেক্সপীয়রের Henry IV দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান', শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজউদ্দৌলা', সিকান্দার আবু জাফরের 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকের উদাহরণ।

সামাজিক নাটক ঃ সমাজের কোন সমস্যা নিয়ে রচিত নাটককে সামাজিক নাটক বলা হয়। সামাজিক নাটকে সমাজের মৌল প্রবণতা এবং নানা অনুষদের প্রতি নাট্যকারকে সতর্ক থাকতে হয়। এ ধরনের নাটকে সমাজের দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দেখা দেয়- পরিণতিতে অশুভ পতন দেখানো হয়। বার্ণার্ড শ'র Heart-break House দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ, নুরুল মোমেনের 'রূপান্তর' প্রভৃতি সামাজিক নাটকের উদাহরণ।

চরিতমূলক নাটক ঃ বিশেষ কোন ব্যক্তিত্বের চরিত্রকে কেন্দ্র করে লেখা হয় চরিতমূলক নাটক। চরিত্রমূলক নাটকে যে ব্যক্তিত্বের জীবন নিয়ে নাটক লেখা হয়, নাট্যকার তার জীবনের বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কিছু কল্পনারও আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তবে এ ব্যাপারে নাট্যকারকে খুবই সচেতন থাকতে হয়, যেন কল্পনার অংশটুকু বিশেষ ব্যক্তিত্বকে বিবর্ণ না করে। বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর', মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল' প্রভৃতি চরিতমূলক নাটকের উদাহরণ।

প্রশ্ন ঃ ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার্থ প্রদান করুন। ট্র্যাজেডি সম্পর্কে এ্যারিস্টটলের ধারণার পরিচয় দিন।

উত্তর ॥ অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্বে পরাভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনীকে সাধারনত ট্র্যাজেডি বলা হয়। এ জাতীয় নাটকে নায়কের বিশেষ কোন মানস প্রবণতা কিংবা ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা সামান্য ভুল-ভ্রান্তির জন্য জীবনে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় দেখা দেয়; কখনো বা দৈব এবং অদৃষ্ট পীড়িত হয়ে তাকে মেনে নিতে হয় করুণ পরিণতি। ট্র্যাজেডির নায়ক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হন এবং অবশেষে তার জীবনে আসে ভয়াবহ করুণ পরিণতি। গ্রীক মনীষী এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে লিখেছেন-

Tragedy, then, is and imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions.

অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞার্থ থেকে ট্রাজেডি নাটকের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য সমূহ আমরা শনাক্ত করতে পারি-

১. ট্র্যাজেডি কোন গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিজাত কর্মের অনুকরণ। এ ধরনের নাটকের ঘটনা হবে সুগভীর ও পূর্ণাবয়ব।

২. ট্র্যাজেডিতে কোন সকর্মক জীবন ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়।

৩. ভাবগৌরবে, শব্দচয়নে এবং সঙ্গীত সংযোগে ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গ প্রসাধিত হয়।

৪. নাটকীয় বিভিন্ন ঘটনাধারা হবে একক পরিণামমুখী।

৫. ট্র্যাজেডি ঘটনাক্ষ্ম, বর্ণনাক্ষ্ম কাহিনী নয়।

৬. ট্র্যাজেডি দর্শনে দর্শকচিত্তে করুণা ও ভীতি সঞ্চারিত হয় এবং অন্তিমে এর নিরসন ঘটে।

ট্র্যাজেডি নাটক মানবজীবনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত আলোড়িত করে দর্শকচিত্ত করুণা ও ভীতিতে পূর্ণ করে দেয়। এখানে মানবজীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা ও অসহায়তার কথা ফুটে ওঠে সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিই জীবনের প্রতি বিদ্বেষ কিংবা বীতারৃহার পরিচয় ব্যঞ্জক নয়। ট্র্যাজেডি দর্শনে মানুষ তার সম্ভাবনার কথা জানতে পারে। তাই ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা থাকলেও, ট্র্যাজেডি দেখে মানুষ আনন্দ পায়।

এ্যারিস্টটলের মতে, মানুষের জীবনের কর্মের যে বহুমাত্রিক অনুকরণ হয়ে থাকে, ট্র্যাজেডিই হচ্ছেসেক্ষেত্রে সর্বোত্তম। কারণ এখানে অভিজাত মানুষের মহৎ কোন কর্মের অনুকরণ করা হয়। ট্র্যাজেডি দর্শনে মানুষ বাস্তবের সব সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে পরাজয় ও বেদনার এক অপরূপ অর্থ ব্যঞ্জনায় পরম আশ্বাস লাভ করে। এ্যারিস্টটলের এই অভিমত ব্যাখ্যাসূত্রেই বিখ্যাত সমালোচক Lucas বলেছেন–

The great tragic writer says 'yea` to life in every fibre of his being, however terrible, grim of ghastly it may appear.

এ্যারিস্টটলের মতে, আত্মবিলুপ্তির মধ্য দিয়ে ট্র্যাজেডি দর্শনকালে আমাদের অর্থাৎ দর্শকের নবজন্ম ঘটে। নায়কের সংগ্রাম আর সাহসিকতার মধ্যে দর্শক আপন সংগ্রামশীল সত্তাকে আবিস্কার করতে পারে।

ট্র্যাজেডি নাটকের মধ্যে এ্যারিস্টটল ছয় প্রকার উপাদানের কথা বলেছেন। এগুলো হচ্ছে– প্লট, চরিত্র, চিন্তা, সংলাপ, দৃশ্যসজ্জা এবং সঙ্গীত। তাঁর মতে, যে কোন ট্র্যাজেডি নাটকেই এই ছয়টি উপাদান পাওয়া যাবে। এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি বর্তমান কালের জন্য প্রযোজ্য হলেও, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তা বলা যায় না। সঙ্গীত ট্র্যাজেডি নাটকে ব্যবহৃত হলেও, সর্বক্ষেত্রে যে তা সত্য এমন কথা বলা যাবে না। এ্যারিস্টটল যে কটি গ্রীক নাটক দেখে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, সেগুলোতে কোরাস বা সঙ্গীত ছিল বলে তিনি সঙ্গীতকে ট্র্যাজেডির উপাদান হিসেবে কল্পনা করেছে।

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- বাংলা নাটকের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- তালিকার মাধ্যমে বাংলা নাটকের ইতিহাস উপস্থাপন করতে পারবেন।
- তালিকার সাহায্যে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলা নাটকের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। তবে আধুনিক অর্থে যাকে আমরা নাটক বলি, বাংলা ভাষায় তা প্রথম পাই আজ থেকে দুশো বছর পূর্বে। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর কলকাতার বেঙ্গলি থিয়েটার-এ মঞ্চস্থ হয় প্রথম বাংলা নাটক 'কাল্পনিক সংবদল'। এটি কোন মৌলিক নাটক নয়, অনুবাদ নাটক। রুশদেশীয় যুবক গেরাসিম স্তেপানভিচ্ লেবেদেফ ইংরেজি নাটক 'দ্য ডিসগাইজ' বাংলায় রূপান্তর করে লেখেন 'কাল্পনিক সংবদল'। এ সময় লেবেদেফ 'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর' নামে আরও একটি কৌতুক নাটক অনুবাদ করেন। এ নাটকটিও কলকাতার বেঙ্গলি থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। নাটকদ্বয় বাংলায় রূপান্তর করতে গিয়ে লেবেদেফ পন্ডিত গোলকনাথ দাসের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। ১৭৯৫ সালে রুশীয় যুবক লেবেদেফের এই সাহসী উদ্যমের পর ধীরে ধীরে বাংলা নাটক বিকশিত হতে আরম্ভ করে।

এখানে একটি কথা আপনি মনে রাখবেন– ১৭৯৫ সালে প্রথম বাংলা নাটকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির নানা শাখায় বিপুল পরিমাণ নাট্য উপাদান বহু পূর্ব থেকেই বিরাজমান ছিল। মঙ্গলকাব্য, লোকসঙ্গীত, পালাগান, গাজীর গান, কবিগান, গম্ভীরা গান, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতির মধ্যে বাংলা নাটকের নানা উপাদান পাওয়া যায়। লোকনাটকের অন্যতম উপাদান নৃত্য এবং গীতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যের এসব নিদর্শনে। কালক্রমে এসব উপাদান থেকেই আধুনিক যুগের বাংলা নাটকের উদ্ভব ঘটেছে।

১৮৫২ সালে রচিত তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' কেই বাংলাভাষা প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর দীর্ঘ দেড়শত বছরে বাংলা নাটক নানাভাবে বিচিত্র মাত্রায় বিকশিত হয়েছে, রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য বহু নাটক। বাংলা নাটকের এই বিকাশধারাকে আমরা নিম্নোক্ত পর্যায়সমূহে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করতে পারি–

ক. সামাজিক নাটক

খ. ঐতিহাসিক নাটক

গ. পৌরাণিক নাটক

ঘ. রূপক সাঙ্কেতিক নাটক

ঙ. প্রহসন ও কৌতুক নাটক

চ. গণনাট্যধারা

ছ. কাব্যনাটক।

সামাজিক নাটকের ধারায় উল্লেখযোগ্য নাট্যকারদের নাম তাঁদের প্রধান রচনার নামসহ নিচে উল্লেখ করা হলো–

নাট্যকার	নাটক
রামনারায়ন তর্করত্ন	কুলীনকুল সর্বস্ব নাটক
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পণ, সধবার একাদশী
মীর মশাররফ হোসেন	জমীদারদর্পণ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	অলীক বাবু
অমৃতলাল বসু	ব্যাপিকা বিদায়
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	প্রফুল্ল
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	পুনর্জন্ম

উপর্যুক্ত তালিকা ছাড়াও আরও অনেক নাট্যকারের সাধনায় বিকশিত হয়েছে বাংলা সামাজিক নাটকের ধারা। কিন্তু আমরা সকলের নাম উল্লেখ করিনি। বলাই বাহুল্য উপরের তালিকাটি একটি নমুনা মাত্র।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় প্রধান নাট্যকারদের নাম তাঁদের প্রধান রচনার নামসহ নিচে উল্লেখ করা হলো–

নাট্যকার	নাটক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	সিরাজদ্দৌলা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রায়শ্চিত্ত
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, নূরজাহান
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	সিরাজদ্দৌলা, গৈরিক পতাকা
মহেন্দ্র গুপ্ত	টিপু সুলতান, মহারাজা নন্দকুমার

পৌরাণিক নাটক রচনায় যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁরা হচ্ছেন– গিরিশচন্দ্র ঘোষ ('বিলমঙ্গল, 'জনা'), অমৃতলাল বসু(হরিশচন্দ্র), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ('সীতা'), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (নর-নারায়ণ'), মন্মথ রায় ('কারাগার') প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একক সাধনায় গড়ে উঠেছে বাংলা রূপক সাঙ্কেতিক নাটকের ধারা। এই পর্যায়ে তাঁর 'অচলায়তন', মুক্তধারা', ডাকঘর, 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকের নামোল্লেখ করা যায়। সাম্প্রতিককালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'জয়হিন্দ বা সোনার স্বপন' সাঙ্কেতিক নাটক হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে।

বাংলা প্রহসন ও কৌতুক নাটক রচনায় যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, গ্রন্থনামসহ তাঁদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

নাট্যকার	নাটক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ
দীনবন্ধু মিত্র	কমলে কামিনী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	কিঞ্চিৎ জলযোগ
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	কল্কি-অবতার, বিরহ

অমৃতলাল বসু	তাজ্জব ব্যাপার
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	আলিবাবা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলা গণনাট্যধারার সূত্রপাত। সাধারণ মানুষকে প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই ধরনের নাটক লেখার মৌল উদ্দেশ্য। এ পর্যায়ে প্রধান নাট্যকারেরা হচ্ছেবিজন ভট্টাচার্য ('নবান্ন', 'আগুন', জবানবন্দী), বিনয় ঘোষ ('ল্যাবরেটরি'), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ('হোমিওপ্যাথি), সুনীল চট্টোপাধ্যায় ('কেরানী'), বিধায়ক ভট্টাচার্য ('আঁঠার পথে'), তুলসী লাহিড়ী ('ছেঁড়াতার) প্রমুখ।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ধারায় কাব্যনাটকের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। কাব্যনাটক রচনায় যাঁরা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো–

নাট্যকার	**কাব্যনাটক**
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, কর্ণকুন্তীসংবাদ, মুক্তধারা, রক্তকরবী, ডাকঘর, রথের রশি
আলোক সরকার	মায়াকাননের ফুল, সিঁড়ি
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	উত্তরমেঘ, শেষ প্রহর
বুদ্ধদেব বসু	তপস্বী ও তরঙ্গিনী, কালসন্ধ্যা, প্রথম পার্থ, অনাম্নী অঙ্গনা, সংক্রান্তি

উপরের আলোচনার সূত্র ধরে বাংলা সাহিত্যের প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের প্রধান প্রধান রচনার নাম প্রকাশকালসহ একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি। বলাই বাহুল্য, এ-ছক একটা নমুনা মাত্র। তবে এ ছকের সাহায্যে বাংলা নাটক সম্পর্কে আপনি একটা ধারণা লাভ করতে পারবেন–

নাট্যকার	**নাটকের নাম**	**প্রকাশকাল**
তারাচাঁদ শিকদার	ভদ্রার্জ্জুন	১৮৫২
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত	কীর্তিবিলাস নাটক	১৮৫২
হরচন্দ্র ঘোষ	ভানুমতি চিত্ত বিলাস	১৮৫৩
রামনারায়ণ তর্করত্ন	কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক	১৮৫৪
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী নাটক	১৮৬০
	একেই কি বলে সভ্যতা	১৮৬০
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পন	১৮৬০
	সধবার একাদশী	১৮৬০
মনোমোহন বসু	সতী	১৮৭৩
মীর মশাররফ হোসেন	বসন্তকুমারী নাটক	১৮৭৩
	জমীদার-দর্পণ	১৮৭৩
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	পুরুবিক্রম	১৮৭৪
অমৃতলাল বসু	তাজ্জব ব্যাপার	১৮৯৪
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	প্রফুল্ল	১৮৮৯
	জনা	১৮৯৪

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	নূরজাহান	১৯০৮
	সাজাহান	১৯০৯
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	প্রতাপাদিত্য	১৯০৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিসর্জন	১৮৯০
	ডাকঘর	১৯১১
	মুক্তধারা	১৯২১
	রক্তকরবী	১৯২৬
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	সিরাজউদ্দৌলা	১৯৩৮
বিজন ভট্টাচার্য	নবান্ন	১৯৪৪
তুলসী লাহিড়ী	ছেঁড়াতার	১৯৫১
উৎপল দত্ত	কল্লোল	১৯৬৮
বাদল সরকার	এবং ইন্দ্রজিৎ	১৯৬৫

বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

উপরের আলোচনা থেকে আপনি বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম জানতে পেরেছেন। লক্ষ করেছেন উপরের আলোচনায় বাংলাদেশের নাট্যকারদের নাম নেই। বাংলাদেশের নাট্যকারদের অবদান স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার উদ্দেশ্যেই আমরা উপরের আলোচনায় তাঁদের নাম উল্লেখ করিনি। এবার আমরা বাংলাদেমের নাট্যকার ও তাঁদের প্রধান প্রধান নাটকের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরবো। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পূর্বে বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ফলে আমাদের এ অঞ্চলে নাটক তেমন বিকশিত হয়নি। দেশবিভাগের পর থেকেই পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে নাটক রচনায় একটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর নাটক রচনা ও নাট্যচর্চায় ব্যাপক রূপান্তর সাধিত হয়। এ সময় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের কারণে বাংলাদেশের নাটকে লাগে পালা বদলের হাওয়া। প্রাক,-স্বাধীনতা পর্বের মৌসুমী নাট্যর্চ্চার পরিবর্তে নাট্যকর্মীরা নিয়মিত নাটক-মঞ্চায়নে উদ্যোগী হলেন, নাট্যকর্মীরা নাটককে গ্রহণ করলেন সমাজবদলের হাতিয়ার হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে নাটক হয়ে উঠলো একটি নিয়মিত শিল্পমাধ্যম। স্বাধীনতার মূল্যচেতনাকে অর্থবহ করার আন্তর গরজে নাট্যকর্মী ও নাট্যকাররা এগিয়ে এলেন নতুন উদ্যমে এবং এভাবেই বাংলাদেশের নাটক অর্জন করলো নতুন মাত্রা। শতাব্দী বহমান নাট্য ঐতিহ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজমানসকে আর প্রতিনিধিত্ব করতে পারলো না; ফলে দেশ কালের দাবিতেই রচিত হলো নতুন নাটক, আবির্ভূত হলেন নতুন নাট্যকার। ইতিহাসের ধূসর আবর্ত আর রূপকথার মোহান্ধতার পরিবর্তে বাংলাদেশের নাটকের প্রধান বিষয় হয়ে উঠলো মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজমানস। সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন কোনো বিষয় নাটককে আর স্থান পেল না, সমাজবিভক্তি নাট্যযুগের ঘটলো অবসান।

১৯৪৭ সালের পূর্বে বাংলাদেশে প্রধানত ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে। এই পর্বে বাংলাদেশের প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের নাটকের নাম নিম্নে উপস্থাপিত হলো–

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
আকবরউদ্দিন	সিন্ধু-বিজয়	১৯৩০
	সুলতান মাহমুদ	১৯৩০
	নাদির শাহ	১৯৫৩
শাহাদাৎ হোসেন	সরফরাজ খাঁ	১৯২১

	আনারকলি	১৯৪৫
	মসনদের মোহ	১৯৪৬
ইব্রাহীম খাঁ	কামালপাশা	১৯২৮
	আনোয়ার পাশা	১৯৩২
ইব্রাহিম খলিল	রেন বিজয়ী মুসা	১৯৪৯
শওকত ওসমান	তস্কর ও লস্কর	১৯৪৫
	কাঁকরমণি	১৯৪৯

১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশের নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটকের পাশাপাশি সামাজিক নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৭ থেকে প্রাক্-মুক্তিযুদ্ধ কালখন্ডে যাঁরা নাটক লিখেছেন, তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো–

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
নুরুল মোমেন	নেমেসিস	১৯৪৮
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর	১৯৬২
	কবর	১৯৬৬
	চিঠি	১৯৬৬
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	বহিপীর	১৯৬০
	তরঙ্গভঙ্গ	১৯৬৫
সিকান্দার আবু জাফর	সিরাজ-উ-দ্দৌলা	১৯৬৫
	মহাকবি আলাউল	১৯৬৬
সাঈদ আহমদ	কালবেলা	১৯৭৬
	মাইলপোস্ট	১৯৭৬
	তৃষ্ণায়	১৯৭৬
আসকার ইবনে শাইখ	বিদ্রোহী পদ্মা	১৯৫২
	অগ্নিগিরি	১৯৫৯
জিয়া হায়দার	শুভ্রা সুন্দরী কল্যাণী আনন্দ	১৯৭০

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ উত্তর কালে বাংলাদেমের নাটকে যে নবতরঙ্গের সূত্রপাত ঘটে, সে কথা পূর্বেই আপনি জেনেছেন। এই সময়ে বাংলাদেমের নাট্যসাহিত্যকে প্রধান পাঁচটি শাখায় বিন্যস্ত করা যায়। নাট্যকার ও তাঁদের প্রদান প্রধান নাটকের নাম আমরা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করছি–

মুক্তিযুদ্ধের নাটক ঃ মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে যাঁরা নাটক লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন– মমতাজউদদীন আহমদ– 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' (১৯৭৬), 'বকুলপুরের স্বাধীনতা' (১৯৮৬), বিবাহ ও কি চাহ শঙ্খচিল' (১৯৮৫); জিয়া হায়দার– 'সাদা গোলাপে আগুন' (১৯৮২), 'পঙ্কজ বিভাস' (১৯৮২); আলাউদ্দিন আল আজাদ– 'নিঃশব্দ যাত্রা' (১৯৭২), 'নরকে লাল গোলাপ' (১৯৭৪); মোহাম্মদ এহসানুল্লাহ– 'কিংশুক যে মরুতে' (১৯৭৪); নীলিমা ইব্রাহিম– 'হে জনতা আরেক বার' (১৯৭৪) প্রমুখ। উপর্যুক্ত নাটকসমূহে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের নানা খণ্ডচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে– কখনো আবেগী ভাষ্যে, কখনো বা শিল্পিত পরিচর্যায়।

প্রতিবাদের নাটক, প্রতিরোধের নাটক ঃ প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ চেতনাই বাংলাদেশের নাটকের প্রধান প্রবণতা। এ ধারায় উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহ হচ্ছে– মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী' (১৯৭৮), 'ইবলিস' (১৯৮২), 'এখানে নোঙর' (১৯৮৪), 'গিনিপিগ' (১৯৮৬); আবদুল্লাহ আল মামুনের 'শপথ' (১৯৭৮), সেনাপতি' (১৯৮০), এখনও ক্রীতদাস' (১৯৮৪); মমতাজউদ্দীন আহমদের 'সাতঘাটের কানাকড়ি' (১৯৯১); সেলিম আল দীনের 'করিম বাওয়ালীর শত্রু বা মূল মুখ দেখা' (১৯৭৩), কিত্তনখোলা (১৯৮৬); রাজীব হুমায়ুনের 'নীলপানিয়া' (১৯৯২); আবদুল মতিন খানের 'মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব; (১৯৮০); এস.এম সোলায়মানের 'ইঙ্গিত' (১৯৮৫) 'এই দেশে এই বেশে' (১৯৮৮) ইত্যাদি।

ইতিহাস-ঐতিহ্য পুরাণ পুনর্মূল্যায়নধর্মী নাটক ঃ মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর কালের ইতিহাস-ঐতিহ্য পুরাণের অনুষঙ্গে নাটক রচনায় সঞ্চারিত হয় নতুন মাত্রা। এ ধারায় উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহ হচ্ছে– সৈয়দ শামসুল হকের 'নূরলদীনের সারাজীবন' (১৯৮২); সাঈদ আহমদের 'শেষ নবাব' (১৯৮৯); মমতাজউদদীন আহমদের 'ারার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা' (১৯৭৬); সেলিম আল দীনের 'অনিকেত অন্বেষণ', 'শকুন্তলা' (১৯৮৬); আবদুল মতিন খানের 'গিলগামেশ' (১৯৮২) ইত্যাদি।

সামাজিক নাটক ঃ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের অন্যতম প্রবণতা বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও রূপান্ত রকরণ। ১৯৭১-উত্তর কালে শেক্সপীয়র, মলিয়ের, মোলনার, বেকেট, ইয়োসেনেস্কো, ব্রেখট, সার্ত, কাম্যু, এ্যালবী প্রমুখ নাট্যকারের নাটক অনূদিত কিংবা রূপান্তরিত হয়েছে। অনুবাদ ও রূপান্তরণে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন কবীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদ্‌দীন আহমদ, আলী যাকের, জিয়া হায়দার, আসাদুজ্জামান নূর প্রমুখ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে বাংলা নাটকের ইতিহাস বর্ণনা করুন।

২. ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে? বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

৩. বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান নাট্যকার এবং প্রকাশকালসহ তাঁদের প্রধান রচনার নাম বিষয়ক একটি ছক তৈরি করুন।

৪. সংক্ষেপে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের পরিচয় দিন।

৫. স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকের প্রধান প্রবণতাসমূহ আলোচনা করুন।

৬. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নাট্যকার এবং প্রকাশকালসহ তাঁদের প্রধান রচনার নাম বিষয়ক একটি ছক তৈরি করুন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে? বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর ॥ ইতিহাসের কোন চরিত্র বা কাহিনীকে নিয়ে রচিত নাটককে বলা হয় ঐতিহাসিক নাটক। এ ধরনের নাটকে নাট্যকারকে ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যকে মেনে চলতে হয়। তবে নাটকের বিশেষ প্রয়োজনে তিনি এক বা একাধিক কল্পিত চরিত্র নির্মাণ করতে পারেন। এ ধরনের নাটকে নাট্যকারকে ঐতিহাসিক সত্য এবং কল্পনার মধ্যে একটা আনুপাতিক সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে সেই নাটকই সার্থক, যেখানে ঐতিহাসিক ঘটনার সহায়তায় নাট্যকার তুলে ধরেন বর্তমানকালের মানবভাগ্যের বিশেষ কোন মুহূর্তটি। ইতিহাসের পুনর্লিখন কখনোই ঐতিহাসিক নাট্যকারের লক্ষ্য নয়, বরং ইতিহাসের কাঠামোতে বর্তমানের জীবনবাস্তবতা উপস্থাপনই তাঁর উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক নাটকে সংলাপ, দৃশ্য পরিকল্পনা, পরিবেশ, ঘটনাংশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ নাট্যরীতি অনুসরণ করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্ব থেকে বাংলা নাটকের উদ্ভব। উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের যাত্রা শুরু। মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম বাংলা ঐতিহাসিক নাট্যকার। মধুসূদনের পর অনেক নাট্যকার নাটক লিখেছেন। বাংলার প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক নাট্যকারের নাম তাঁদের প্রধান রচনার নামসহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো–

নাট্যকার	নাটকের নাম
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	সিরাজদ্দৌলা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রায়শ্চিত্ত
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	সাজাহান
	চন্দ্রগুপ্ত
	নূরজাহান
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	বাংলার মসনদ
	আলমগীর
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	সিরাজদ্দৌলা
	গৈরিক পতাকা
মহেন্দ্র গুপ্ত	পিটু সুলতান
	মহারাজা নন্দকুমার
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর
সিকান্দার আবু জাফর	সিরাজ-উ-দ্দৌলা
আসকার ইবনে শাইখ	অগ্নিগিরি
সাঈদ আহমদ	শেষ নবাব

প্রশ্ন ঃ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকের প্রধান প্রবণতাগুলো আলোচনা করুন।

উত্তর ॥ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর কালে বাংলাদেশের নাটকে নবতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এ সময় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের কারণে বাংলাদেশের নাটকে লাগে পালা-বদলের হাওয়া। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের মৌসুমী নাট্যচর্চার পরিবর্তে নাট্যকর্মীরা নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নে উদ্যোগী হলেন, নাট্যকর্মীরা নাটককে গ্রহণ করলেন সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী কালে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের বিকাশধারাকে আমরা প্রধান পাঁচটি শাখায় বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করতে পারি। এই শাখাগুলো নিম্নরূপ–

ক. মুক্তিযুদ্ধের নাটক
খ. প্রতিবাদের নাটক : প্রতিরোধের নাটক
গ. ইতিহাস-ঐতিহ্য পুরাণ পুনর্মূল্যায়ধর্মী নাটক
ঘ. সামাজিক নাটক
ঙ. অনুবাদ নাটক : রূপান্তরিত নাটক

মুক্তিযুদ্ধের নাটক ॥ বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের অন্যতম প্রবণতা হচ্ছেমুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা। মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে যাঁরা নাটক রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন মমতাজউদদীন আহমদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, জিয়া হায়দার, সৈয়দ শামসুল হক, রণেশ দাশগুপ্ত, সাঈদ আহমদ, কল্যাণ মিত্র, আল মনসুর, রাবেয়া খাতুন প্রমুখ। মমতাজউদদীন আহমদের, বিবাহ ও কি চাহ শঙ্কচিল', সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' এবং কল্যাণ মিত্রের 'জল্লাদের দরবার' মুক্তিযুদ্ধের নাটক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে।

প্রতিবাদের নাটক : প্রতিরোধের নাটক ঃ মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের একটি প্রধান প্রবণতাই হচ্ছেপ্রতিবাদ ও প্রতিরোধচেতনা। এ ধারায় যাঁরা স্মরণীয় অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মমতাজউদদীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, সেলিম আল দীন, আবদুল মতিন খান, এস.এম সোলায়মান, কবীর আনোয়ার, রাজীব হুমায়ুন প্রমুখ। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ চেতনা বাংলাদেশের যে সব নাটককে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে আছে মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী', 'ইবলিস', 'এখানে নোঙর; আবদুল্লাহ আল মামুনের সেনাপতি', এখনও ক্রীতদাস', সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা'; মমতাজউদ্‌দীন আহমদের 'সাতঘাটের কানাকড়ি'; আবদুল মতিন খানের 'মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব'; কবীর আনোয়ারের 'জনে জনে জনতা' ইত্যাদি।

ইতিহাস ঐতিহ্য পুরাণ পুনর্মূল্যায়নধর্মী নাটক ॥ উনিশশ' একাত্তর-উত্তর বাংলাদেশের নাটকের একটি উল্লেযোগ্য প্রবণতা হচ্ছেইতিহাস ঐতিহ্য পুরাণের পুনর্মূল্যায়ন প্রচেষ্টা। এ ধারায় যাঁরা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হক, সাঈদ আহমদ, মমতাজউদদীন আহমদ, সেলিম আল দীন, আবদুল মতিন খান, মামুনুর রশীদ প্রমুখ নাট্যকারের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইতিহাস ঐতিহ্য পুরাণের পুনর্মূল্যায়নধর্মী বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হচ্ছেসৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনের সারাজীবন', সাঈদ আহমদের 'শেষ নবাব', মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের 'ারার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা', সেলিম আল দীনের 'শকুন্তলা', আবদুল মতিন খানের 'গিলগামেশ', মামুনুর রশীদের 'লেবেদেফ' ইত্যাদি।

সামাজিক নাটক ॥ স্বাধীনতা-উত্তর কালে সমাজের অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিচ্যুতি আর মুক্তিযোদ্ধাদের বিপথগামিতা নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক নাটক। এ ধারায় উল্লেযোগ্য নাটক রচনা করেছেন আবদুল্লাহ আল মামুন। এ ছাড়া অন্য যেসব নাট্যকার সামাজিক নাটক রচনায় বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদদীন আহমদ, রশীদ হায়দার, আতিকুল হক চৌধুরী, সেলিম আল দীন, হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, এস.এম সোলায়মান, আল মনসুর, গোলাম আম্বিয়া নূরী প্রমুখ। এঁদের সম্মিলিত সাধনায় বাংলাদেশের সামাজিক নাট্যধারা সমৃদ্ধ হয়েছে।

অনুবাদ নাটক : রূপান্তরিত নাটক ॥ স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের অন্যতম প্রবণতা বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তরকরণ। সময়ের এই পর্বে অনুবাদ ও রূপান্তরিত নাটকের ধারায় যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন,

তাঁদের মধ্যে আছেন সৈয়দ শামসুল হক, কবীর চৌধুরী, মমতাজউদদীন আহমদ, আলী যাকের, জিয়া হায়দার, আতাউর রহমান, আসাদুজ্জামান নূর, খোন্দকার আশরাফ হোসেন প্রমুখ।

বাংলাদেশের নাটক এখন দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে আমাদের সাহিত্যের এই খাখাটি আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পাঠ ৬

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সিকান্দার আবু জাফরের জীবন ও সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকের প্রাসঙ্গিক পরিচয় লিখতে পারবেন;
- সিরাজ-উ-দ্দৌলার ট্র্যাজিক ইতিহাস নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে সব নাটক লেখা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

সিকান্দার আবু জাফরের জীবন কথা

সিকান্দার আবু জাফর ১৯১৯ সালের ৩১ মার্চ খুলনা জেলার সাতক্ষীরার (বর্তমানে জেলা) তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমী আর মাতা জোবেদা খানম। কবির প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ সিকান্দার আবু জাফর হাশেমী বখত। সিকান্দার আবু জাফরের পূর্বপুরুষ পেশোয়ারের অধিবাসী ছিলেন। কবির প্রপিতামহ পেশোয়ার থেকে খুলনায় এসে বসবাস করতে থাকেন।

সিকান্দার আবু জাফরের কৈশোর কেটেছে খুলনা জেলার তালা গ্রামে। তালা গ্রামের বি.ডি. উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ১৯৩৭ সনে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলের শিক্ষাজীবন শেষে তিনি কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন। বি.এ শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় তিনি পড়ালেখা ছেড়ে দেন।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্তির পর ১৯৪১ সালে তিনি চাকুরী জীবন আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি কলকাতার একটি সরকারী সংস্থায় চাকুরি গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি সাংবাদিকতার দিকেও খানিকটা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ পর্যায়ে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত হন। চাকুরি এবং সাংবাদিকতার পাশাপাশি স্বাধীন ব্যবসার প্রতিও তিনি একসময় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি 'সেনটেড কোকোনাট অয়েল' নামে নারকেল তেলের ব্যবসা করেন, কিন্তু লাভজনক না হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি এ ব্যবসা ছেড়ে দেন।

১৯৪৭ সালে নানা জটিলতা, ষড়যন্ত্র আর গোপন আঁতাতের ফলে ভারত বিভক্তির পর সিকানদার আবু জাফর কলকাতার জীবন ছেড়ে পূর্ববাংলার ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় শুরু হয় সিকান্দার আবু জাফরের দ্বিতীয় জীবন। ঢাকায় এসে একদিকে সাহিত্যচর্চা, অন্যদিকে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন সিকান্দার আবু জাফর। ১৯৪৮ সালে তিনি বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু নারকেল তেলে ব্যবসার মতো এক্ষেত্রেও তিনি ব্যর্থ হলেন। এ সময় তিনি কিছুকাল ঢাকা ও কলকাতা উভয় এলাকায় যাতায়াত করেছেন ব্যবসায় সাফল্য লাভের আশায়। কিন্তু তিনি ব্যবসায় কখনো সফল হননি।

১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে সিকান্দার আবু জাফর স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেন। চাকুরির পাশাপাশি আবার তিনি ব্যবসার চেষ্টা করেন। প্রথমে চামড়ার ব্যবসা আরম্ভ করেন তিনি। এ ব্যবসায় বড় রকমের আর্থিক ক্ষতি হলে তিনি আরম্ভ

করেন গুরুর ব্যবসা, ইটের ব্যবসা ইত্যাদি। কিন্তু সর্বত্রই তিনি ব্যর্থ হন। বস্তুত, ব্যবসায়ে ব্যর্থতাই ছিল তার নিত্য-সহচর।

সিকান্দার আবু জাফরের জীবনের একটা বৃহত্তর অংশ জুড়ে আছে তাঁর সাংবাদিক কর্মধারা। কলকাতা থেকে ঢাকায় আসার পরে তিনি দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকায় সম্পাদীয় বিভাগে কিছুদিন কাজ করেন। দৈনিক 'সংবাদের' প্রথম সম্পদকীয় তাঁরই লেখা। 'সংবাদের' পর তিনি 'ইত্তেফাক' এবং মিল্লাত' পত্রিকায়ও সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন।

১৯৫৭ সালে সিকান্দার আবু জাফরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বিখ্যাত 'সমকাল' পত্রিকা। বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে 'সমকাল' পত্রিকার অবদান অসামান্য। 'সমকাল' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। নতুন লেখক সৃষ্টিতে 'সমকাল'-এর সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক পালন করেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। বস্তুত, 'সমকাল' পত্রিকার সম্পাদনা সিকান্দার আবু জাফরের জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'অভিযান' পত্রিকা। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'অভিযান' পত্রিকার প্রকাশ একটি দুঃসাহসী এবং ঐতিহাসিক ঘটনা।

সিকান্দার আবু জাফরের সাহিত্যজীবনও গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিতে ভাস্বর। স্কুল জীবন থেকেই তিনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। কর্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকে তাঁর সাহিত্যসাধনা। একে একে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছড়া ও অনুবাদগ্রন্থসমূহ। গীতিকার হিসেবেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একজন সুরকার হিসেবেও তিনি সমধিক পরিচিত।

বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গেও সিকান্দার আবু জাফরের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁর 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে' গানটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিপুল প্রেরণার উৎস হয়ে কাজ করেছে। বাংলাদেশের সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর সংগ্রাম ছিল নিরলস ও অকুণ্ঠ।

১৯৪৬ সালে সিকান্দার আবু জাফর পুষ্প সেনকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর পুষ্প সেন নার্গিস জাফর নামে পরিচিতা হন।

১৯৭৩ সাল থেকে সিকান্দার আবু জাফরের নানা শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয়। তিনি প্রায়শই হাঁপানী রোগে কষ্ট পেতে থাকেন। হাঁপানী রোগ বেড়ে গেলে ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে তাঁকে পি.জি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই ১৯৭৫ সালের ৫ আগস্ট রাত ৩.২০ মিনিটে সিকান্দার আবু জাফর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সিকান্দার আবু জাফরের সাহিত্যকর্ম

কবিতা

১. প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), ২. বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৫), ৩. তিমিরান্তিক (১৯৬৫), ৪. কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮), ৫. কবিতা- ১৩৭৪ (১৯৬৮), ৬. বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১), ৭. বাঙলা ছাড়ো (১৯৭২)।

গানের বই

১. মালব কৌশিক (১৯৬৬)

উপন্যাস

মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), ২. জয়ের পথে (১৯৪৩), ৩. পূরবী (১৯৪৪), ৪. নূতন সকাল (১৯৪৬)

নাটক

১. সিরাজ-উ-দ্দৌলা (১৯৬৫), ২. মহাকবি আলাউল (১৯৬৬), ৩. মাকড়সা (১৯৬০ সালে পত্রিকায় প্রকাশ), ৪. শকুন্ত উপখ্যান(১৯৬৮)

অনুবাদ

১. যাদুর কলস (১৯৫৯), ২. সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১), ৩. পশ্চিমের পারাবাত (১৯৬২), ৪. রুবাইয়াৎই ওমর খাইয়াম (১৯৬৬), ৫. সিংগের নাটক (১৯৭১)।

পাঠ্যপুস্তক

নবীকাহিনী (১৯৫১), ২. আওয়ার ওয়েলথ (১৯৫১)

সম্পাদনা

সমকাল (মাসিক) ১৯৫৭-১৯৭৫, অভিযান (সাপ্তাহিক) - ১৯৭১

নির্বাচিত নাটক প্রসঙ্গ

সিকান্দার আবু জাফরের 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে (পৌষ ১৩৭২)। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উ-দ্দৌলার পরাজয় ও পতনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে আলোচ্য নাটক। ইতিহাসের ধূসর আবর্ত থেকে কাহিনীর মৌল উপাদান গৃহীত হলেও, সিকান্দার আবু জাফর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আলোচ্য নাটকে বর্তমান কালের জীবন জিজ্ঞাসাকে ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে প্রতিস্থাপন করেছেন। তাঁর হাতে পলাশীর ইতিহাস পুনর্জীবন লাভ করেছে। বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর সংগ্রামশীল সত্তা প্রকাশের আন্তরগরজেই নাট্যকারের সিরাজ-উ-দ্দৌলা স্মরণ। 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের ভূমিকায় সিকান্দার আবু জাফরের অভিমত এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়-

জাতীয় জাগরণের প্রয়োজনে উদ্দীপনার প্রেরণা হিসেবে সিরাজ-উ-দ্দৌলা জাতীয় বীরের আসন লাভ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক নায়ক রূপে সিরাজ-উ-দ্দৌলা আজ সর্বজনপ্রিয় চরিত্র। এই সাফল্যের পথ প্রসারিত হয়েছে জাতীয় নাট্যান্দোলনের মাধ্যমে। উক্ত আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়।.....

রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমেও সিরাজ-উ-দ্দৌলার কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা হয়েছে। ইংরেজের সুপরিকল্পিত আন্ত র্জাতিক প্রচারণার অবিসংবাদী সত্য হিসেবে গৃহীত সিরাজ-উ-দ্দৌলার বর্বরতার সবচেয়ে ভয়াবহ দৃষ্টান্ত 'অন্ধকূপ হত্যা' সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। অন্ধকূপ হত্যার স্মারক স্তম্ভ 'হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণে রাজনৈতিক নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে কলঙ্ক স্তম্ভটি চূর্ণ করবার জন্যে তাঁর প্রত্যক্ষ আত্মনিয়োগের আমি চাক্ষুষ সাক্ষী।

জাতীয় চেতনা নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। কাজেই নতুন মূল্যবোধের তাগিদে ইতিহাসের বিভ্রান্তি এড়িয়ে এবং প্রেরণার উৎস হিসেবে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে আমি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। একান্তভাবে প্রকৃতই ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজ-উ-দ্দৌলার জীবননাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি। ধর্ম এবং নৈতিক আদর্শে সিরাজ-উ-দ্দৌলার যে অকৃত্রিম বিশ্বাস, তাঁর চরিত্রের যে দৃঢ়তা এবং মানবীয় সদগুণগুলির চাপা দেবার জন্যে ঔপনিবেশিক চক্রান্তকারী ও তাদের স্বার্থান্ধ স্তাবকেরা অসত্যের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল, এই নাটকে প্রধান সেই আদর্শ এবং মানবীয় গুণগুলিকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।

নাট্যকারের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকেই আপনি অনুধাবন করতে পারবেন কেন তিনি সিরাজ-উ-দ্দৌলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাহিনী নিয়ে আলোচ্য নাটক করেছেন। সিরাজ-উ-দ্দৌলার চরিত্রের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ যেসব কলঙ্ক লেপন করতে চেয়েছিল, সিকান্দার আবু জাফর সিরাজ-উ-দ্দৌলার পতনের কথা বলতে গিয়ে সে কলঙ্ককে মোচনের চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসকে অবলম্বন করে তিনি নতুন করে ইতিহাস লেখেননি, বরং নির্মাণ করেছেন কালজয়ী সাহিত্য। ১৯৬৫ সালে আইয়ুবী শাসনের যাঁতাকলে পূর্ববাংলার মানুষ যখন দিশেহারা, তখন সিকান্দার আবু জাফরের এই নাটক রচনা ভিন্নতর মাত্রা নির্দেশকও বটে। তিনি চেয়েছেন সিরাজ-উ-দ্দৌলার শক্তি আর সাহস আর দেশপ্রেমকে পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে, যাতে তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে। এই সূত্রে আলোচ্য নাটক রচনা ও প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি সাহসী কর্ম।

সিরাজ-উ-দ্দৌলার পরাজয় ও পতনকে নিয়ে সিকান্দার আবু জাফরের পূর্বে এবং পরে একাধিক নাট্যকার নাটক রচনা করেছেন। বর্তমান আলোচনায় সে সব নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানও এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আপনার জানা প্রয়োজন।

সিরাজ-উ-দ্দৌলার ট্র্যাজিক ইতিহাস নিয়ে প্রথম নাটক রচনা করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর নাটক প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ই(১৯০৫) তিনি এই নাটক রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' পাঁচ অঙ্কের নাটক, যেখানে মোট ৩৬টি দৃশ্য রয়েছে। এই নাটকেও গিরিশচন্দ্র সিরাজ-উ-দ্দৌলার চরিত্রে আরোপিত কলঙ্কমোচনের চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় তাঁর অভিমত- 'বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন।' এভাবে সিরাজ-চরিত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাতে নতুন মহিমা ও মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হলো।

সিরাজ-উ-দ্দৌলার ট্র্যাজিক পরিণতি নিয়ে সবচেয়ে মঞ্চসফল ও বহুল পঠিত নাটক রচনা করেছেন সচীন সেনগুপ্ত। বস্তুত, শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকই বাংলার রঙ্গমঞ্চে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক। শচীন সেনগুপ্তের নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ সালে। তাঁর 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' ৩ অঙ্কের ৯ দৃশ্যের নাটক। নাটকে ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে নাট্যকার নিপুণতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন কল্পনার সত্যকে। এখানে নাট্যকার সিরাজ চরিত্রকে বাঙালি জাতির নায়করূপে নির্মাণ করেছেন।

সিকান্দার আবু জাফরের পরে সিরাজ-উ-দ্দৌলা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক লিখেছেন সাঈদ আহমদ। সাঈদ আহমদের 'শেষ নবাব' প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন- 'সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে আমি নবরূপে উপস্থাপন করতে চেয়েছি। নতুন কিছু বলবারও চেষ্টা করেছি।' আলোচ্য নাটকে সাঈদ আহমদ ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের নিহত সিরাজ-উ-দ্দৌলার পতনের মৌল কারণ তুলে ধরেছেন। ফলে ইতিহাসের অনেক তথ্য তিনি বাদ দিয়েছেন, ইতিহাস সন্ধান করে পরিবেশন করেছেন প্রকৃত সত্য। সাঈদ আহমদের 'শেষ নবাব' নাটক প্রসঙ্গে কবি শামসুর রাহমানের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন–

আরেকটি কথা। 'শেষ নবাবে'র পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে বারবার আমার মনে পড়েছে সমকালীন বাংলাদেশের কথা। আর সবকিছু ছাপিয়ে সিরাজদ্দৌলার অন্তরালে এক অতিকায় ছায়ার মতো জেগে রয়েছেন সেই মহানায়ক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যাঁর নাম। সৎ সাহিত্যের একটি গুণ এই যে তা কোনো বিশেষ কালে সীমাবদ্ধ থাকে না।

উপরের আলোচনায় আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন সকল নাট্যকারেরই মৌল উদ্দেশ্য সিরাজ চরিত্রে আরোপিত কলঙ্কমোচন এবং তাঁর অতুল দেশপ্রেমের শিল্পরূপ নির্মাণ। এভাবে, বাঙালি নাট্যকারের হাতে সিরাজ-উ-দ্দৌলা নতুন মহিমায় হলেন অভিষিক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে সিকান্দার আবু জাফরের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করুন।

২. সিকান্দার আবু জাফরের সাহিত্যকর্মের পরিচয় দিন।

৩. সিকান্দার আবু জাফরের 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের একটি সাধারণ পরিচয় প্রদান করুন।

৪. 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' বিষয়ক উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখুন।